

হাংরি বেঙ্গল

(১৯৪৩-এর নভেম্বরে চিত্ত প্রদানের মেদিনীপুর সফর)

মেদিনীপুর ঘাওয়ার পথে ট্রেনের ভিড়ঠাসা কামরায় বসে থাকতে থাকতে বারবার আমার মনে ফিরে আসছিল কলকাতার ফুটপাথের রোজকার দৃশ্যগুলো। সেই ক্ষয়ে-যাওয়া, নিঃসহায় জ্যাক্ত কংকালের মিছিল—কোন একদিন যারা গড়ে তুলেছিল গ্রাম-বাংলার গোটা সমাজ। জেলে, মাঝি, কুমোর, তাঁতি, চাষী। পরিবারের পর পরিবার। শিয়ালদা স্টেশন আর আমহাস্ট স্ট্রিটের মাঝের এই ছোট সড়কটিতে একদিন ভোর বেলা স্বচক্ষে দেখা পাঁচ পাঁচটা শব্দেহ। এবং আরো নানা ভয়ংকর দৃশ্য সে-সময় শহরের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিল সে-সব। আর, মৃতদের ও মৃত্যুমুখীদের এই ভিড়ের মধ্যে শতকরা আশি ভাগই যে সম্ভবত মেদিনীপুর থেকে আসা—এ-কথাটাও মনে আসছিল।

ভাষ্য

বস্তা-পিছন আধ-সের

আমার উল্টোদিকেই সম্পন্ন গোছের দু-জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসে বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। একজনের পরনে ছিল ধোপাদুর্গত ধূতি আর ‘পাঞ্জাবি’; আরেকজনের খাকি পোশাক, একটি ‘আই. ই.’ ব্যাজ সম্বলিত। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার সংগে সংগে বাধ্য হয়েই তাঁরা একটু গলা চড়িয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। আর আমি শুনতে পেলাম ধূতি-পরা ব্যক্তিটিকে বলতে—‘খুব কম করেও ধরো বস্তা-পিছন আধ-সের। তাহলেও দাঁড়াচ্ছে প্রায় পাঁচশো সেরের মতো—মানে সাড়ে বারো মণ। এখন তুমি যদি মণ-পিছন তিরিশ টাকা দাম করো তো লোকে হামলে পড়বে। আর মাল পাঠানো নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না—ওটা আমি দেখবো ‘খন।’

খাকি পরা ব্যক্তিটি বললেন—‘বড়বাবুর সংগে কথা বলা এক প্রচণ্ড ঝকঝক। তা ছাড়া আমি যেই ওঁর কাছে যাবো, অমনি ওনার দাঁওটাও যাবে বেড়ে।’

—‘আরে বাড়তে দাও না!’ বললেন ধূতি-পরা ভদ্রলোক—‘উনি কত চাইবেন? পঞ্চাশ টাকা? একশো টাকা? দেড়শো? তাহলেও আমাদের ঢের লাভ থাকবে। আর, তা ছাড়া, আমার অসুবিধের কথাটাও ভাবো! আমার ওপর ইতিমধ্যেই ওদের নজর পড়েছে।...’

এরপর কামরার চারপাশটা একবার খুব সযত্নে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক আবার তাঁর গলা নামিয়ে আনলেন ফিসফিস শব্দে। বাকি পুরো পথে ওঁদের ওই গভীর ও

গুরুদ্বপুর্ণ আলোচনার একটা শব্দও আমি ধরতে পারিনি। আর শেষ পর্যন্ত ঠুঁদের মধ্যে বোঝাপড়ার খসড়াটা যে কী দাঁড়াল তার বিন্দুবিবসর্গ আঁচ করতে পারিনি।

ট্রেন মেদিনীপুর পৌঁছোল রাতে। শুনলাম একটা ব্যাংকে নাকি আমার বাবাকে ট্রেনে করে পাঠানো চাল ও আটার খালাস ও বিলির দায়িত্ব দিয়েছে। এ-বিষয়ে বাবা আমাকে যে কথাটা প্রথমেই বলল, সংগে সংগেই সেটা বেশ নাড়া দিল আমাকে— প্রতিটি কনসাইন্মেন্টে যা পাঠানো হয় তার চেয়ে নাকি অনেকটা কম রিসিভ্ করা হয়। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল ট্রেনে শোনা সেই রহস্যময় আলোচনাটির কথা। আর, এই লম্বা জার্নিতে কতগুলো ‘হাফ্ সের’ যে বস্তাগুলো থেকে চুরি হয়ে গেছে তাই ভাবতে লাগলাম।

এদিকে এমনকি আমরাও প্রতিদিন ভাত খেতে পাবার মতো সৌভাগ্যবান ছিলাম না। রেশনে চালের বদলে আটা দেওয়া হচ্ছিল। হস্তায় অন্তত দুবার আমাদের বাধ্য হয়ে দু-বেলাই আটা খেতে হত।

আশাও নয়, লজ্জাও নয় !

পরিদিন সকালে শহরটা একটু ঘুরে দেখতে বেরলাম। ঘূর্ণিঝড়ের চিহ্নগুলো তখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি। পথের পাশে পাশে তখনও ভেঙে-পড়া বাড়ি আর উপড়ে-পড়া গাছ পড়িছিল। ঘরছাড়া ভিখিরির দল তখনও দরজায় দরজায় ভিক্ষে চেয়ে ফিরিছিল, যদিও তাদের অধিকাংশকেই এর মধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন দ্রাণশিবিরে। ওইসব লঙ্গরখানাগুলোয় তখনও আসছিল প্রায় সাতশো কি আটশো লোক— যেখানে এই সংখ্যাটা কিছুদিন আগেই ছিল দু-হাজার। সরকার জোর করে সমস্ত ‘আমন’ ধান কেড়ে নেবে কি-না এ-নিয়ে চায়ের দোকানগুলোয় চলিছিল গরম আলোচনা।

কয়েকজন উদ্বাস্তুর সংগে কথা বললাম আমি। তাদের বেশিরভাগই মেদিনীপুর ও খজপুর্ শহরের ছ-সাত মাইল এলাকার গ্রামগুলোর বিভিন্ন পরিবার থেকে এসেছিল। আর সবাই একই কথা বলছিল— ‘খুব শিগগিরই— কাল বা পরশুই— আমরা গ্রামে ফিরে যাব। আমন পেকেছে। আমরাই ভাগচাষ করে ফলিয়েছি এই ধান। আর খুব ভাল ফলনও হয়েছে এ-বছর। আমাদের ফিরতেই হবে।’ তারা সকলেই অপেক্ষা করছিল শুধু একটা জিনিসের। আসছে পূর্ণিমায়ে মল্লিকবাবুরা নাকি বিনা পয়সায় কাপড় বিলি করবেন। ধানকাটায়ে একটু দৌর হলেও, এ-সন্ধ্যোগ কি করেই বা ছাড়ে ওই অর্ধনগ্ন, কম্পমান মানব্জনে ?

ট্রেন জিজ্ঞাসাবাদ করে তবেই এদের একটি পরিবারের গোটা বৃত্তান্ত জানতে পারি। ওরা এসেছিল মেদিনীপুর শহর থেকে ন-মাইল দূরের চন্দ্রা গ্রাম থেকে। জুন মাসে বাড়ি ছেড়েছিল ওরা— স্বামী স্ত্রী আর তিন বাচ্চা। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল

ওদের গল্পটায় কোথায় যেন একটা খুঁত রয়ে যাচ্ছে। অবশেষে, অনেক দোনামনার পর, যখন নিশ্চিত হল আমি সরকারের লোক নই তখন মহিলাটিই জানাল সত্যিকারের গল্পটা।

‘— সত্য বলতে কি বাবু, কীটা আশা করে আমরা গ্রামে ফিরব? গেলবারেও খারাপ ফলন হয়নি, কিন্তু তবু নিজেদের গ্রামে আমরা কিছুই খেতে পাইনি। ধানকাটার দু-দিনের মধ্যে সব ধান হাওয়া হয়ে গেল। আমরা যে গ্রামে যাব বলছি সে কেবল মিলিটারির ভয়ে। কেউ জানে না আমাদের ধরলে ওরা আমাদের কোথায় পাঠাবে— আমাদের বাচ্চাদেরই বা কোথায় পাঠাবে। ওরা যদি আমাদের গ্রামেই ফেরত পাঠায় তাহেই বা কী লাভ?’

‘— তোমরা কি তাহলে এই শহরে দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে চাইছ? তোমরা কি তাহলে শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভিখারি হিসেবে দেখতে চাইছ?’— জিজ্ঞাসা করলাম।

‘মোটাই না।’ দৃঢ় জবাব আসে। ‘কেন আমরা নিজেদের ভিখারি হতে দেবো? আমরা তো এখনও কারুর দয়ার ওপর বেঁচে নেই। আমরা দু-জনেই খাটি। মিলিটারির জন্যে পাথর ভাঙি, মালগাড়িতে কাঠ বোঝাই করি, ওঁদের জমিদারবাবুদের বাগানে যে-সব পুকুর খোঁড়া হচ্ছে সেগুলোয় কাজ করি। আমরা প্রত্যেকেই দিনে ছয় থেকে আট আনা পাই। আর শহরে তাও একটু ভাত পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামে টাকা দিলেও কিছুই পাওয়া যাবে না। ক্ষেতগুলোয় এত সুন্দর ফলন হয়েছে—আপনি কি ভাবছেন ধান-কাটা হয়ে গেলে এগুলো আমরা, আর চোখের দেখাও দেখতে পাবো গো বাবু?’

এরা হল শূদ্ধ একটা পরিবার—আরো পাঁচ-ছটি পরিবারের সংগে রেল স্টেশনের কাছে পথের ধারে গাছতলায় বাসা বেঁধেছিল ওরা। আমি বউটির কাছে আরো জানতে চাই— ‘এরা সবাই কি মিলিটারির ভয়ে তোমাদের মতোই আসল কথাটা লুকোচ্ছে?’—

তা জানি না বাবু, কিন্তু ওরা সকলেই আমাদের মতো খেটে খাচ্ছে।

আরেকটি উদাস্তু গোষ্ঠীর কথা বলি, এরা সবাই মেয়ে। দু-জন বৃদ্ধা, তিনজন মাঝবয়সী বিধবা, একটি কিশোরী। বিধবাদের মধ্যে একজনের কোলে ছিল একটি এগারো-দিনের শিশু; আরেকজন ছিল অন্তঃসত্ত্বা। একটা বিরাট আমগাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে ওরা একটা মালসায় করে জল গরম করছিল। এতসব আরোজন শূদ্ধ কোথাও থেকে যোগাড় করে আনা সের খানেক না-ভাঙা গম সৈন্দ্য করার জন্য। বাড়ি ফেরার ব্যাপারে তাদের প্রশ্ন করতে, বিড়বিড় করে তারা কিছু একটা উত্তর দিল, যার মানেটা সে-মুহূর্তে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি যেটুকু বুঝলাম তাতে মনে হল যে তাদের জন্য বাড়ির লোকেরা সবাই অপেক্ষা করছে, কিন্তু মিল্লিকবাবুদের কাপড় বিলি না-হওয়া অর্থাৎ তারা থেকে যেতে বাধ্য। বিধবাদের একজন বলল, তার কেউ নেই; সে নিজেই আর কজনের সংগে ভাগ্যচাষীর কাজ করে কিছু ফসল ফলিয়েছে। কিন্তু এই মহিলাটির সম্বন্ধেই একটু পরে আরেকজন জানালো, ‘ওর সোয়ামি স্টেশনে কুলিগারি করে। একটু পরেই সে ফিরবে।’ আর সদ্যোজাতটির

মা বলল, 'আমি কালই ফিরে যাব। আমার ভাই আসছে গরুর গাড়ি নিয়ে।'

প্রায় পক্ষকাল বাদে ওই একই রাস্তা দিয়েই ভোর তিনটের রিকশা করে স্টেশনে যাওয়ার সময়ে এমন কিছু দেখলাম যা এই ভাগ্যহীনা মহিলাগুলির ওই তিড়িতি বৃত্তান্তের সমস্ত অসামঞ্জস্য ও সমস্ত বৈপরীত্যের পরিষ্কার ব্যাখ্যা এনে দিল। দেখি একটি পুলিশ কনস্টেবল রদখদ দেখতে দুই যুবক আর এক কিশোরীর (আমি মেয়েদের যে দলটির সঙ্গে কথা বলেছিলাম এই কিশোরীটি সেই দলে ছিল।) সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। রিকশাওয়ালা বদ্বিষয়ে বলল, — 'বদ্বালেন না বাবু এই মেয়েলোকগুলো শরীর বেচতে শুরুর করেছে। আর করবেই বা কী? দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা উপোস দিতে হলে মান-সম্মান লাঞ্ছলজ্ঞার বালাই আর থাকে না। এদেরকে আমি রোজ রাতে এই রাস্তা দিয়ে ভাড়া নিয়ে যাবার সময়ে দেখতে পাই।

স্থানীয় পার্টি কমরেডরা আমাকে বোঝালেন বর্তমান খাদ্য-সংকট নিয়ে সব রকম জনসভার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞাই এখন তাঁদের সামনে প্রধান অসুবিধা। কিছুদিন আগেই, নভেম্বর-সপ্তাহের সময়ে সি. আই. ডি.-র একটা লোক নাকি প্রকাশ্যে দিবালোকে আমাদের 'ইউনিট' পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দিয়েছিল এবং মহল্লার বাসিন্দাদের শাসিয়ে গিয়েছিল এই বলে যে, এ-অঞ্চলে ফের ওই রকম পোস্টার দেখলে পুলিশ খুব কড়া অ্যাকশন নেবে।

পোস্টারের বিষয়টা কী ছিল? দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম চালানোর জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান, দেশীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর দাবি, আর এই মর্মে এক উদ্দীপক ঘোষণা যে জনগণ তাঁদের দূরদেশের পক্ষ নিতে চান।

এ-ব্যাপারে যখন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে নালিশ জানানো হয়, তিনি ব্যাপারটি নিয়ে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। কোনো তদন্ত করা হয়েছিল কি-না জানা যায়নি, কিন্তু এর দু-দিন পরেই সি. আই. ডি.-র ওই একই অফিসারকে এই তল্লাটে দেখা যায় আবার পোস্টার ছিঁড়তে (যে পোস্টারগুলি ছিল আমনের ফলন বিষয়ে) এবং স্থানীয় লোকজনকে হুমকি দিতে।

আমলাতন্ত্রের এ-হেন পরিস্থিতিতে, শ্রদ্ধা এক মদুঠো খাবারের জন্য কয়েকটি স্ত্রীলোককে নিজেদের শরীর বিক্রয়ে বাধ্য হতে দেখে আমি একটুও অবাক হইনি। মৌদীনীপুরের জনগণ, বাংলায় জাতীয় আন্দোলনে সর্বদাই অগ্রগামী ছিলেন, সেই জনগণকে, স্থানীয় আমলাদের নগণ্য শাসনিত্তে সম্প্রস্তু হতে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কষ্টদায়ক হলেও সত্যি কথাটা হল পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলার সময় ন্যূনতম প্রতিবাদ জানাননি একজনও।

উল্টো হণ্টন

চৌঠা নভেম্বর আমি কাঁথির উদ্দেশে রওনা দিলাম বহুদিনের পরিচিত কৃষককর্মী

মৌদীনীপুরের কমরেড্‌ তারাপদ চক্রবর্তীর সংগে। খুব ভোরে আমরা পেঁঁছলাম বেলদা স্টেশনে। কলকাতার ফুটপাথ ছেড়ে গ্রামের লোকেরা একজন দূ-জন করে ফিরে আসছিল। ‘ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিলে, বললে বোম্‌ পড়বে, রোগ হবে, লোক মরবে—কে জানে আসলে কী চায় ওরা!’ অন্ধকারে একটি খেতমজুদর বিড়বিড় করছিল। ‘আজ তিন মাস হল গ্রাম ছেড়েছি। ভগবানই জানেন ফিরে গিয়ে কী দেখতে হবে।’ আগনের ভাল ফলনের সম্ভাবনার কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। অবিস্বাস-ভরা ‘হুন্‌!’ উচ্চারণ করে অন্যত্র চলে গেল লোকটি।

বেলদা থেকে ভোরবেলা কাঁথির বাস ছাড়ে। আমরা যৌদীন ঘাই সৌদীন মাত্র দুটো বাস ছিল—প্রতিটিতে সত্তরজন করে লোক এবং সঙ্গে অস্ত্রত দূ-মণ ওজনের মাল। শুনলাম কপাল ভাল থাকলে কোন কোন দিন তিনটে বাসও পাওয়া যায়, তবে তার বেশি কখনোই না। দিন দু-য়েক আগে নাকি এস. ডি. ও. এসেছিলেন তদারক করতে এবং বেশি লোড্‌ নেওয়ার জন্য বাস-মালিকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জানাচ্ছিলেন। অবশ্য তিনি বাস বাড়ানোর কোন প্রতিশ্রুতি দেননি; আর পেট্রোল-ঘাটতর জন্য তেমন কোন আশাও নেই।

রাস্তার হাল একেবারে যাচ্ছেতাই। যন্ত্রত ধাক্কা। আর গতে ভীত। ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে আর কোন মেরামত হয়নি। ফলে আমাদের যাত্রাপথে কম করে বার দশেক ব্রেকডাউন হল। তিন ঘণ্টার যাত্রায় সময় লাগল তার প্রায় দ্বিগুণ।

পথে এগরায় আমরা দেখলাম নিম্নায়মান উদ্বাস্তু-শিবির। এর মধ্যেই অনেক উদ্বাস্তু ভিড় হয়েছে সেখানে। কিছুদিন আগে একটি হাসপাতালও খোলা হয়েছিল। ওই সময়ে সেখানে প্রায় আশি-নব্বই জন রুগী ছিল। এই রুগীদের মধ্যে মৃত্যুর হার তখন দৈনিক পাঁচ থেকে দশ। সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা খুঁটিয়ে দেখার জন্য নামার সময় আর পেলাম না।

পাঁচমাইল ফেরিঘাটে নৌকা ধরা এক কঠিন সমস্যা। উদ্বাস্তুদের বিশাল ভিড়ই এর কারণ। বেশিরভাগই ছিল কুমোর। কয়েকজনকে দেখলাম কাদার মধ্যে ঠেলাগাড়ি থেকে ধরে পড়া খাদ্যকণা কুড়োতে। বাস থেকে নামামাত্রই একটি ছ’-সাত বছরের বাচ্চা মেয়ে আমার পায়ে এসে পড়ল। অনেক কণ্টে তাকে কাটিয়ে, ভিড় ঠেলে, নৌকায় উঠলাম আমি। দীর্ঘ সেখানেও সেই মেয়েটা ঠায় আমার মুখ চেয়ে রয়েছে। এক বগ্‌গাভাবে সে নদীর ওপার অবধি আমাকে অনুসরণ করল।—‘বাবি পরসায় যেখানে খাবার দেয় সেখানে যাচ্ছিস না কেন?’—জিজ্ঞেস করলাম। ‘আমাদের গ্রামে নাই।’ জবাব দিল মেয়েটি। ‘আরেকটা গ্রামে যেতাম, সেখানেও বন্ধ হয়ে গিছে।’

দেব্‌তারী বাসা বদলান

আমরা কাঁথি পেঁঁছলাম, দুপুর গড়িয়ে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুদিন খুব উদাসীন

ছিলাম। কিন্তু এখন, অনেকগুলো রাত জেগে, বিচ্ছিন্ন রাস্তায় লজ্জা-মার্ক বাসের ভয়ংকর ঝাঁকুনি আর কাঁপুনি সহ্য করার পর, ক্লান্তিতে আমি প্রায় আধমরা। শব্দ তারাপদর উৎসাহ এখনও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওর মতে কাঁথিতে ওর অসংখ্য বন্ধুদের কাছে আমরা নাকি দারুন অভ্যর্থনা পাব। সেসবের লোভনীয় বৃত্তান্তও আশা জাগাচ্ছিল। বাস্তবে কী পেয়েছিলাম সে-কথায় আসছি।

সেদিনটা ছিল কাঁথির হাটবার। দোকান আর খন্দেরের কোনো ঘাটতি ছিল না; কিন্তু চালের ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ল না কোথাও। বজরা আর কলাইয়ের ডালের দোকানগুলোয় কিছু ভিড় ছিল ঠিকই, কিন্তু স্যাকরা আর কাঁসার বাসনের দোকান-গুলোয় ছিল ঢের বেশি ভিড়। স্যাকরাদের দোকান ঠিক কতগুলো ছিল গুণে উঠতে পারলাম না। তবে, কাঁসার বাসনের দোকান ছিল এগারোটা। বাঁশ আর মাদুর দিয়ে বানানো মাচার ওপর সাজানো হয়েছিল দোকানগুলো; আর, মহাজনেরা বসেছিল মাটিতে, ক্যাশ-বাক্স আর হালখাতা নিয়ে। প্রতিটি দোকানেই প্রায় দশ-পনেরোজন লোক ভিড় করে আছে। বেশির ভাগই চাষী। অপেক্ষা করছে নিজেদের বাসনপত্র বেচবে বলে। বাসনের মধ্যে শব্দ নীতি-ব্যবহার খালা-বাটি-বাটাই ছিল না, পেতলের পিলসুজ, ঘণ্টা, প্রদীপ, তামার কোষাকুঁষ ইত্যাদি পুজোর সাজ-সরঞ্জামও ছিল। এমনকি এক জাগরায় পেতলের তৈরি বেনারসী শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমাও দেখলাম। ওটা বিক্রি হল দু-টাকা বারো আনায়।

দেবতার চলে যাচ্ছেন গরিব আশ্রিতদের ছেড়ে। পেটমোটা হিন্দু বেনিয়া ভক্তদের ধামে। আমার মনে হল মহাসভার কিছু নেতা 'হিন্দু সংগঠন'র যে প্রতিশ্রুতি দেন তার খাঁচও খুব সম্ভব ওরকমই। মেদিনীপুর রিলিফ সেন্টারে আগেই আমরা দেখেছিলাম এক পুরোহিতকে, সপরিবার ভিখারি হয়ে গেছেন। এক সময় তাঁর পঞ্চাশ বিঘে জমি ছিল— আর ছিল দু-শোটি যজমান পরিবার। সে সবই হারিয়ে গিয়েছিল; আর, পুরোহিত পরিণত হয়েছিলেন ভিক্ষুকে।

গত বছরের ঘূর্ণিঝড়ের চিহ্ন কাঁথিতে এখনো বেশ দৃষ্টিগোচর ছিল। বোমা-বিধবস্ত চটগ্রামে যা দেখেছি তার থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না সেসব দৃশ্য।

এখন পলিটিক্সের বাইরে

আশ্রয়ের আশায় প্রথমে আমরা গেলাম জনৈক প্রবীণ কংগ্রেসী কর্মীর বাড়িতে। তারাপদ বলেছিলেন, উনি খুব বড়লোক এবং আন্তর্জাতিকতার জন্য বিখ্যাত। বাড়িটা দেখে সত্যিসত্যি খুব বড়লোকের বাড়ি বলেই মনে হল। তাঁর অভ্যর্থনার উষ্ণতায়ও কোন সন্দেহই রইল না যে তিনি তারাপদকে বেশ স্নেহ করেন। কিন্তু তারাপদ আমার পরিচয় দেওয়ারাত্র তিনি একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করো না ভাই,

আমার আবার আজ কোর্টে বিশেষ কাজ পড়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পারি আমাকে ওইদিকে দৌড়তে হবে।— এই বলে, কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

আধঘণ্টা খোঁজাখন্ডিজর পর সেই ঠিকানাটিতে পৌঁছলাম। এটি আগে কংগ্রেসের অফিস ছিল। এখন হিন্দু-মহাসভা কেন্দ্র। দরজায় ‘মহাসভা নারী সমিতি’ বা ওইরকম কিছুর একটা সাইনবোর্ড ঝুলিছিল। অনেকক্ষণ ধরে দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোন উত্তর না পেয়ে আমরা সোজা ভেতরে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি আহাররত এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক (তারাপদর কাছে পরে জানতে পারি, ভদ্রলোক আগে কংগ্রেসী ছিলেন— কিন্তু এখন মহাসভাপন্থী হয়ে গেছেন)। খেতে-খেতে ভদ্রলোক কিছুর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও খোঁজখবর নিলেন। খাওয়া শেষ হতেই বললেন, ‘আপনাদের জন্যে খুব কিছু করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না ভাই— আমি এখন পলিটিক্সের বাইরে চলে এসেছি মোটামুটি। তা ছাড়া কোর্টে একটা কেস নিয়ে আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি। আমাকে এখনি সেখানে যেতে হবে।... তা যাই হোক, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনাদের একটা ছোট্ট গুটি হয়েছে। এটা একটা মেয়েদের আগ্রহ। এখানে অনুমতি ছাড়া ঢোকা নিষেধ।’ ‘না ঢুকে কোন উপায়ও ছিল। কারণ আমরা দরজায় কড়া নেড়েও কোন উত্তর পাইনি।’ ব্যাখ্যা করলাম আমরা। ‘তাছাড়া আপনারা যেমন জনগণের সেবক আমরাও তো তাই।’

কোন উত্তর না দিয়ে তিনি শূন্য জুতো পরতে শুরুর করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ‘কজন মহিলা থাকেন এখানে? তাঁদের কী ধরনের কাজ দেওয়া হয়?’ ‘বাঁধাধরা কোন সংখ্যা নেই।’ উত্তর এল, ‘কখনো বাড়ে, কখনো কমে। কাজ বলতে বোনাটোনা এইসব। আচ্ছা বেশ, আসুন তাহলে, আমার দোর হয়ে যাচ্ছে।’ এই বলে সাত তাড়াতাড়ি রওনা হলেন ভদ্রলোক।

তারাপদর জানপহঁচান আরেকজনের কাছেও একটু চেষ্টা চরিত করলাম আমরা। ইনিও একজন কংগ্রেসী; প্রায় স্থানীয় নেতার পর্যায়ে; নাম সত্যীশ জানা। বর্তমানে ইনি জনকল্যাণ-সংস্থাগুলির প্রায় প্রতিটির সংগেই যুক্ত; এবং বিশেষ করে মহাসভার সংগে।

রিলিফ কমিটির অফিসেই তাঁকে পেয়ে গেলাম আমরা। আমরা এসেছি বলে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন তিনি। তারপর মৃত্যুর হার, সেবাকর্মের পরিধি এবং এ-বিষয়ে তাঁর কার্যকলাপ প্রভৃতির ওপর একটা বেশ লম্বাচওড়া বক্তৃতি বাড়লেন। বক্তৃতি শেষ হলে আমাদের বললেন, পাশের বাড়িতে গুজরাট সেবা সমিতির অফিসে গিয়ে জনৈক কংগ্রেস-কর্মীর সংগে দেখা করে থাকার ব্যবস্থাদি করতে।

গুজরাট সেবা সমিতির কংগ্রেস-কর্মীটি কিছুর হিসেবপত্র নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। লেজার থেকে এক মদহুতের জন্য চোখ তুলে তাকালেন তারাপদর দিকে। চিনলেনও সংগে সংগেই!

তারপর, প্রায় পনেরো মিনিট ধরে, তারাপদ যার্কিহু বলল সে-সবেরই উত্তরে তিনি শূদ্ধ জ্ঞানালেন ‘হুন্ম’। আমি এদিকে গা-ছাড়াভাবে একটা মাদুরের ওপর ইতিমধ্যেই একটু গড়িয়ে নিয়োছি। এতক্ষণে তারাপদরও খুব রোখ চেপে গেছে দেখলাম। আর বেশি কিছু না বলে ও সটান ঘ্রানের যোগাড়যন্ত্র শূদ্ধ করে দিল। কংগ্রেসী-কর্মীটি কোন একটা দরকারে বাইরে বেরোলেন। দু-তিনজন যুবক এগিয়ে এলেন আমাদের সাহায্যার্থে। দেখে মনে হল এঁরা গুজরাট সেবা সমিতির কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক।

ঘ্রানের পর সবে আমরা খাদ্য-সমস্যা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা শূদ্ধ করছি, এমন সময় মাঝবয়েসী কংগ্রেসী কর্মীটি ফিরে এলেন। এসেই একাট খবরের কাগজ হাতে তুলে নিয়ে বলে উঠলেন, ‘এবার বলুন আপনাদের কী বলার-টলার আছে।’ অসীম ধৈর্য নিয়ে তারাপদ গোড়ার থেকে শেষ অবধি ইতিমধ্যে বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলে ভদ্রলোক আগের মতোই ‘হুন্ম, হুন্ম’ করে যেতে লাগলেন। শেষে হঠাৎ ছুঁড়ে নামিয়ে রাখলেন কাগজটা এবং টেবিলের ওপর একটা চড় মেরে চিৎকার করে উঠলেন, ‘আপনাদের সবকিছু সহ্য করতে আমরা রাজি; কিন্তু যে ব্যাপারটার আমাদের রক্ত জ্বলে ওঠে তা হল আপনাদের এই বিরাট উৎসব করে ব্রাড্ ব্যাংকে রক্তদান করার ব্যাপারটা। আর কাদের জন্যে? যে মিলটারি আমাদের দেশে এত অনাহার ও দুর্দশার কারণ স্বয়ং তাদেরই জন্যে। এটা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সত্যিই এটা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। জেলে থাকার সময় আমি স্বচক্ষে দেখছি এসব।’— এতদূর বলেই আবার তিনি খবরের কাগজটিতে ডুব দিলেন।

তারাপদ বদ্বিগ্নে বলার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল; কিন্তু উত্তেজিত কংগ্রেসী কর্মীটি কিছু শুনছিলেন বলে মনে হল না। তারাপদ যখন গ্রাণকার্যে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের পরিধি নিয়ে সংখ্যা-টংখ্যা উদ্ভূত করতে শূদ্ধ করল, তিনি বললেন, ‘ওসব প্রচার, ভিত্তিহীন প্রচার।’ তারাপদ ন্যাশনাল ইউনিটি প্রসংগে এল। ভদ্রলোক বললেন, ‘আপনাদের এই ইউনিটি-টা আসলে নিছক একটা অশ্বাভিষ, যেমন গান্ধীজীর অহিংসা।’ তারাপদ বিভিন্ন ঘটনা উদ্ভূত করল। উত্তর এল, ‘ওসব নেহাৎই প্রচার।’ ভদ্রলোকের মতে জাপান আমাদের শত্রু না মিত্র তা স্থির করা অসম্ভব। কারণ জাপানীরা বোমা ফেলছে স্রেফ ব্রিটিশরা এখানে রয়েছে বলে। আর ব্রিটিশরা এখানে রয়েছে বলেই আমাদের এতসব দুর্দশার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। শেষমেষ তিনি আচমকা তাঁর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন— আমাদের পক্ষে ওখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এই বলে তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন, ভাবটা যেন আমাদের বাইরে অবধি এগিয়ে দেবেন। একজন দেশসেবকের কর্তব্য আরেকজন দেশসেবককে সাহায্য করা— এমন কথাতেও টলানো গেল না তাঁকে। শেষে অগত্যা আমাদের বেরোতেই হল। তিনিও বোরিয়ে এলেন, দরজায় তালা দিলেন এবং কোন একটা কাজের দোহাই দিয়ে অন্যত্র প্রস্থান করলেন।

তারাপদ তো অবাকের একশেষ । পথে নেমে বলল— ‘ভদ্রলোক কখনো এমন ছিলেন না । কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ঠাঁর ধ্যানধারণা একেবারেই অন্যরকম ছিল ।’

অবশেষে আমরা বাধ্য হলাম একটা চায়ের দোকানে আগ্রয় নিতে । ঠিক হল যে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আমরা তারাপদের পরিচিত আরেকজন কংগ্রেসী নেতার সংগে দেখা করব । যেখানে তিনি থাকেন, সেখানে যেতে হলে ছ-মাইল হেঁটে একটা গ্রামে যেতে হবে ।

গুজরাট সেবা সমিতির এক স্বেচ্ছাসেবককে পথপ্রদর্শক হিসেবে পাওয়া গেল । বিশ বছরের এক উজ্জ্বল যুবক ; নাম শ্রীপতি । মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের এই যুবকটি বেশ শিক্ষিত । উৎসাহী কংগ্রেসী দেশপ্রেমিক হিসেবে সে আমাদের ও আমাদের পার্টির প্রতি একটু যেন কৌতূহলীও হয়ে উঠেছে মনে হল । যে কংগ্রেসী নেতাটির সংগে আমরা দেখা করতে যাচ্ছিলাম, শ্রীপতি খুব ভালই চিনত তাঁকে । কিন্তু তাঁর গ্রামে যাবার রাস্তাটা তত ভাল চিনত না । সেটা ধরা পড়ল পরে ।

রাস্তায় তারাপদের আরেক পরিচিতের সংগে দেখা । গ্রামের এক মাঝবয়েসী ডাক্তার । তারাপদ তাঁকে ডাকা মাত্রই ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সোদিকে এগিয়ে এলেন । এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘কংগ্রেস না মহাসভা ?’ তারাপদ বলল, ‘কিষণ সভা । কমিউনিস্ট ।’— ‘যাক, তাও বরং ভাল !’ একগাল হেসে মন্তব্য করলেন ডাক্তারবাবু, ‘আরে দাদা, ভগবানের দিবা দিয়ে বলছি, আজকাল যেন কংগ্রেসের নাম শুনলেই আঁতকে উঠি ।’ চারপাশে সতর্ক চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি আরো বললেন, ‘বিশ্বাস করুন ভাই, এই স্বদেশী-স্বদেশী খেলাটাকে আর প্রশ্রয় দেওয়াটা আমার পক্ষে বৃদ্ধ বৈশি হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানীং । ...আচ্ছা বেশ, চলি তাহলে, পরে আবার দেখা হবে’খন । আমার আবার কোটে’ একটা কাজ আছে ।’ স্বরিত প্রস্থান ।

পেতল কাঁসার দোকানগুলোর ভিড় বেলা দু-টোর মধ্যেই পাতলা হয়ে এল । শুনলাম প্রতিদিনই নাকি কোলাঘাট থেকে একটা পেতল কাঁসার মালভর্তি স্টিমার ছাড়ে, এবং কখনো কখনো সংগে কিছন্ন মালভর্তি দিশ নৌকাও থাকে । গত এক মাস যাবত এই চলছে । আমি ভাবতে লাগলাম, কত চাষীই না এইভাবে বাধ্য হয়েছেন ঘরের শেষতম কাঁসার বাসনিটিও বেচে দিতে ।

সাব-রোজগিষ্টি অফিসে প্রায় মেলার মতো ভিড় ছিল । শুনলাম প্রতিদিন নাকি বেশ কয়েকশো জমি-হস্তান্তর-দলিল নথিভুক্ত হচ্ছে । এসব দলিলে কী ধরনের দামটাম লেখা হাছিল সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না ; তবে তার একটা উদাহরণ শুনলাম যে এক বিধে সফলা আবাদী জমি নাকি বিক্রি হয়েছে আধ মণ চালের বিনিময়ে !

যেখানে শকুন আর লুটেরাদের রমরমা

কাঁথি থেকে বড়জোর আধ মাইলটাক দূরের একটি গ্রাম । প্রথমে সেখানেই গেলাম ।

এরপর আমাদের কী ধরনের দৃশ্য যে দেখতে হবে এখানেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেলাম। পুকুরপাড়ে বাঁশঝোপের তলায় পড়ে আছে মানুষের একটা খুলি, আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিছুর হাড়গোড়। শ্রীপতি সব ঘূর্ণিঝড়ের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেছে। যে জন্য আমি ভেবেছিলাম ঘূর্ণিঝড়ে নিহত মানুষের দেহাবশেষ ওই হাড়গোড়। শ্রীপতিই শব্দধরে দিল, 'না, না, ঝড়ে নয়, হয়তো এ বেচারার ম্যালেরিয়া কিংবা অনাহারে মারা যাওয়া হতভাগ্যদেরই একজন। লাশটা বোধহয় কোথাও পড়েছিল। কেউ সংকার করেনি। কুকুর আর শকুন খেয়ে হাড়গোড় ছড়িয়ে রেখেছে।'

পুকুরের ওপারেই দেখলাম খাঁ-খাঁ করছে বেআরু ও জনমানবশূন্য একটি গ্রাম।

খানিক দূর এগিয়ে আরেকটি গ্রামে পৌঁছলাম। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন এক বিধবা মহিলা। শতছিন্ন চটে নিজের শরীর যথাসম্ভব ঢেকেচুকে। তাঁর কাছে থেকে জানা গেল, ওই এলাকায় শব্দ গতমাসেই জ্বরে ভুগে মারা গেছে ডজনখানেক লোক। জানা গেল, মহিলাটি খেতে দিনমজুরের কাজ করে নিজের খরচ নিজেই চালাচ্ছেন; আর তাঁর পরিবারের তিন মরদ ও এক মেয়ে গেছে কাঁথিতে— চাকরির খোঁজে।

ঘূর্ণিঝড়ের চিহ্নগুলো তখনও এত টাটকা যেন ঠিক আগের দিনই ঘটেছে। উপড়ে-পড়া গাছ-গাছালির শব্দকিয়ে-যাওয়া ডালপালা, এখানে-ওখানে হাওয়ার কাঁপছিল খড়কুটো। বড় বড় কুঁড়েরের মাটির ভিত্তের ওপর তখনও গজায়নি ঘাস। পবিত্র তুলসি-ঝোপ তখনও সাজিয়ে রেখেছে উঠোনটাকে। এই উঠোন প্রায় এক শ্মশানের মতো অনাবৃত ও সমতল।

ঝড়ে আর বন্যায় সবকিছু কুঁড়েরই কিন্তু উড়ে যায়নি বা ভেঙে পড়েনি। যে ঘরগুলো তখনও দাঁড়িয়েছিল তাদের ছাউনিগুলোয় বন্যায় ভেসে আসা কাপড়চোপড়ের টুকরো-টাকরা পড়ে পড়ে রোদ্দুরে পচছিল। গ্রামের চওড়া পথগুলো বহুদূর ঘাবৎ জনহীন থেকে থেকে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ঘাস আর বুনো ঝোপের তলায়।

নভেম্বরের সেই বিষণ্ণ গোখলির নীরবতায়, ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল যেন চারপাশে স্তুপীকৃত এই মানব দুর্দশার গভীরতাকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করার সমস্ত শক্তিই হারিয়ে ফেলেছি আমি।

পাঁচটা নাগাদ যে গ্রামটিতে আমরা পৌঁছলাম তার নাম জানুবসন। গোটা পাঁচেক বড়সড়ো কুঁড়ের তখনও দাঁড়িয়ে ছিল— আর আশপাশের ছড়ানো ধ্বংসস্তূপ ইঙ্গিত দিল আরো গোটা পাঁচেক ঘরের। বিশাল বিশাল গাছ ওপড়ানো অবস্থায় পড়েছিল কাছেই একটা সাময়িক দ্রাণ-শিবির থেকে সমস্ত লোকই চলে গেছে দেখা গেল। গাছের

ফাঁক দিয়ে অর্ধনির্মিত ঘাণ-শিবিরটির মাটির দেয়ালগুলো দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওই দেয়ালগুলো পেরিয়ে বাকি পুরো এলাকাটাই জনমানবশূন্য ও পরিত্যক্ত মনে হল। আমরা সবে কুঁড়েঘরগুলো ঘুরে দেখতে শুরুর করেছিলাম, এমন সময় প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মতো আবির্ভূত হল এক দম্পতি। মেয়েটির পরনে ছিল নতুন কোরো শাড়ি—সম্ভবত লঙ্গরথানাগুলো থেকে বিতরণ করা সাধারণ কাপড়গুলোর একটি; আর পুরুষটির পরনে ছিল খাটো একখানা ধুতি। বড়জোর গামছার চেয়ে একটু বড়। মনে হল তারা যেন সংগে করে নিয়ে চলেছে তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি। অর্থাৎ কিনা, একটি ছোটো পোটলা আর একজোড়া মাটির মালসা। তারা আমাদের দেখতে পেয়েছে বলে মনেই হল না। যেন তারা নিজেদের দুঃখকষ্ট নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে আর কোনকিছুর জন্য কোন সময় দেওয়াই সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। আমরা ডাকাডাকি করতে বলল, তারা চলেছে কাঁথির দিকে। ধীরে আরো গুলুটিকয় প্রস্থ করে ওদের পুরো বৃত্তান্ত জানা গেল। গ্রামটায় নাকি তিনশো লোকের বাস ছিল। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে একশোরও বেশি লোককে। তারপর ম্যালেরিয়া আর এই অনাহারের ফলে মারা গেছে আরো বেশ কিছু। এখন নাকি শূন্য তারা দুজনই বেঁচেবর্তে আছে। বাদবাকিরা বেঁচেছে শহরে পালিয়ে।

কিন্তু এই অসময়ে তারা কেন শহরের দিকে চলেছে? এর একটা লাগসই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তারা চলে যাচ্ছে ডাকাতের ভয়ে। দশদিন আগে এক রাতে ভিক্টোর চাল ফুটিয়ে নিচ্ছে তারা এমন সময় নাকি প্রায় জনা চিল্লিশেক ডাকাত তাদের ওপর চড়াও হয়। দু-জনকেই বেধড়ক পেটায় ডাকাতরা। তারপর দু-দুটো দিন লোকটা নাকি মাথা তুলতে পারেনি এমন পিটুনি দিয়েছিল। ডাকাতের লুটের মাল বলতে ওই আধসেখ চাল আর শেষ দুটি কাঁসার বাসন। দম্পতির শেষ সম্বল। তাদের পরনের অপরিষ্কার কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল ডাকাতেরা। টানা দুদিন লজ্জা নিবারণের একটা ত্যানা পর্যন্ত জোটেনি মেয়েটির।

ডাকাত আসার সময় ওরা যে কুঁড়েঘরটিতে ছিল সেটা দেখলাম। একেবারে ভাঙা-চোরা। ছাদের একটা অংশ উড়ে গেছে— আর দেয়ালে রচিত হয়েছে বড় বড় গর্ত।

দম্পতিটি দাঁড়াল না আর। আমরা গেলাম ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরগুলি ঘুরে দেখতে। উত্তরদিকের ঘরটি ছিল দোতলা। তখনও গোয়ালঘরের খুঁটিগুলোয়-বাঁধা ছেঁড়া দড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল। ছিল জাবনা রাখার বিরাট বিরাট মাটির গামলা। তুলসিতলার পাশে ঢেঁকিটা প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছে বড় বড় ঘাসের তলায়।

মৃত্যুর ছায়া এসে প্রতিটি কুঁড়েঘরকেই করে তুলেছিল বিষম। ভেতরে মানুষের ব্যবহার্য কোন জিনিসের চিহ্নমাত্র নেই। ছিল শূন্য অন্ধকার। আর বিশ্রী একটা গন্ধ। ম্যালেরিয়ার চেয়ে আরো সাংঘাতিক কোন রোগ ওইসব জায়গায় দানা বাঁধেছিল শূন্যেও অবাক হতাম না আমি।

শ্রীপতি কথা বলছিল ডাকাত নিয়ে। বলল কোন একটা পল্লীতে নাকি বাইশ দিনে চাবলিশটা ডাকাত হয়েছে।

অনামা সেইসব দেশপ্রেমী প্রাপ্য সম্মানটুকুও ঘাঁড়ের জোটেন

‘সরকারকে ধানের একটি দানাও নয়’— এ-ই ছিল গত অগাস্টে মেদিনীপুরের জনগণের সংকল্প। আর তাই কাঁথিতে, এক জোতদারের তিন-তিনটি গোলায়, হাজার হাজার মণ ধান আগুনে পুড়েছিল একটানা সাত-সাতটা দিন ধরে। পরে, বাসে এক সহযোগী আমাকে বলেছিলেন যে তিনি নিজে নাকি পাঁচ শ’ মণ চাল মাটির তলায় পুঁতে নষ্ট করেছিলেন। আরেকজন শোনালেন, ‘আমার মজুত কত আছে তা সরকার যাতে জানতে না পারে সেজন্যে আটশোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।’ আরেক জায়গায় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা বাজারে যাওয়ার পথে বেশ কয়েক হাজার মণ চাল ফেলে দিয়ে-ছিলেন নদীতে।

শুধু বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মেদিনীপুরের জনগণ তখন বুঝতে পারেননি যে তাঁদের এই ক্রোধে সরকারের কোনই ক্ষতি হচ্ছে না— শুধু নিজেদের অনাহারের পথটা তৈরি করছিলেন তাঁরা। সরকারের হাতে চাল তুলে দেব না পণ করে সেই চাল তাঁরা তুলে দিচ্ছিলেন মজুতদারদের হাতে। সরকারের সংগে লড়তে গিয়ে তাঁরা এভাবে ঘরের শত্রুদের হাতই আরো মজবুত করে তুলছিলেন। স্বদেশপ্রেম এইসব মজুতদারদের ঘোলাটে লেনদেনগুলো ঢাকার পক্ষে ছিল খুব সুবিধাজনক একটা মদ্যখোশ। কিন্তু এই ‘দেশপ্রেমী’-রাই পরে বিদ্‌মার বিধাবোধ করেনি একমুঠো খাদ্যের জন্য হাহাকার করতে থাকা ক্ষুধার্ত চাষীদের ওপর পুঁলিশ লেলিয়ে দিতে।

খালধার দিয়ে যাবার সময়ে এক মিনিট অন্তর অন্তর হয় শ্রীপতি নইলে তারাপদ ‘ওই যে, আরেকটা’— বলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল মাটিতে পড়ে থাকা খুলি-গুলোর দিকে। শ্রীপতি ব্যাখ্যা করে বলল,— ‘আজকাল আর পোড়ানোর বালাই-ই নেই। লাশগুলো স্নেহ খালে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আপনি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন তো অন্ধকার হবার আগেই ঠিক দেখতে পাবেন নিদেন এক-আধটা লাশ ভেসে আসছে।’

‘এই লোকটা নিশ্চয়ই খুব ধার্মিক ছিল!’ বলল শ্রীপতি। আমাদের ডানদিকে কিছুদূরে জ্বলতে থাকা একটা চিতাকে লক্ষ করেই তার এই উক্তি। ‘অবশ্যই ধার্মিক ছিল’, বলল তারাপদ, ‘তা নইলে এই দুর্দিনে মরেও কী করে কপালে সংকার জুটল?’

গ্রামগুলো সবই পরিত্যক্ত। হাজারে হাজারে লোক খাদ্যের খোঁজে সব ছেড়ে চলে গিয়েছে। যারা পড়ে আছে তারা ভুগছে ম্যালেরিয়া, কলেরা আর অনাহারে। অন্যান্য বছর নভেম্বরে মাঠগুলো দেখে মনে হয় ধানের হাসিভরা সমুদ্র। ‘ধানভরা খেত তো নয়, যেন সোনার পরাত...’ উৎসাহে বর্ণনা করে যাচ্ছে শ্রীপতি,— ‘ধানের একেকটা

শিষ্য পাকা কলার একেকটা কাঁদর চেয়েও বড়।' সেই একই কাঁথিতে খেতগদুলো এখন মরুভূমির মতো ধু ধু করছে— আর দিগন্তে-দিগন্তে জ্বলছে শুধু চিতার আগুন। সামগ্রিকভাবে এরকমই ছিল কাঁথির ছবি।

যে পথ দিয়ে আমরা হাটছিলাম বিরাট একটা বিলের ধার ঘেঁষে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সেই পথ। মেরামতি না হওয়া বাঁশের সাকো, বাঁধানো পাড় এসব দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে রাস্তাটা গ্রামের কোন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। যাই হোক, ছ-টি ঘণ্টা ওই রাস্তা দিয়ে ঠায় হেঁটে আমরা মোট আটজনের বেশি লোকের দেখা পেলাম না। এদের মধ্যে দু-জন ভিন গাঁয়ে তাদের আত্মীয়ের সংগে দেখা করে বাড়ি ফিরেছিল; আর বাকি ছ-জনকেই দেখলাম বিলের নোংরা হাটুজলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত। প্রায় পুরো পথটাই ঢেকে গিয়েছিল ঘোপেঘোড়ে। গেল বর্ষার পর এই পথ দিয়ে কেউ হেঁটেছে বলেই মনে হচ্ছিল না।

আমরা হাটছিলাম দক্ষিণ অভিমুখে। রাস্তায় দু-জন জানাল, আমাদের গন্তব্যস্থল অর্থাৎ গোপালপুর যেতে হলে প্রথমে মাইল দু-য়েক বড় রাস্তা বরাবর পশ্চিমে যেতে হবে, এবং তারপর দক্ষিণের দিকে আরো পাঁচ কি ছ-মাইল হাটতে হবে।

এই পথনির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমের দিকে প্রায় আধ-মাইল হাটার পর আমরা খেজুর আর নারকোল গাছে ঘেরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। মনে হল কোনো এক সময়ে এখানে বসতি ছিল। কিন্তু এখন এখানকার রাস্তাঘাটে গজিয়ে উঠেছে কোমর অবধি উঁচু ঘাস আর ঘোপ। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে কিছুদূরে কাদাভর্তি একটা নিচু জমির দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ— কিন্তু কোন পায়ের চিহ্ন পেলাম না সেখানেও। আমাদের উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে কয়েকটা বড়সড় ব্যাঙ কাদার ওপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। তারাপদ প্রাণ করল গ্রামের ভেতর ঢুকে পরিত্যক্ত কোনো কুঁড়েঘরে রাস্তা কাটাতে। আর শ্রীপতি ওঁদিকে তেঁটোর কথা বলছে। কিন্তু আমরা কিছুতেই রাস্তা খুঁজে পেলাম না। তারাপদ চিৎকার করতে লাগল। যাতে কেউ শুনতে পায়। কিন্তু কোন উত্তর নেই। তবু হাল ছাড়বে না তারাপদ। শেষকালে পরামর্শ দিল, অন্য একটা রাস্তা খুঁজে বের করা উচিত।

অন্য রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ এগিয়ে আমরা যে জায়গাটায় এসে পৌঁছলাম সেটা শ্মশান বলেই মনে হল। একটা খেজুর গাছ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। গাছটার মাথা সম্ভবত বড়ে উড়ে গিয়েছে। তার নিচে ভাঙা কলসী, ছেঁড়া মাদুর, বিছানার চাদর-টাদরের টুকরো— অর্থাৎ শবদাহের শেষ চিহ্নগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। আর ছিল অসংখ্য হাড়ের টুকরোর সংগে পড়ে থাকা কম করে সত্তেরোটি নর-করোটি!

‘গ্রামের ঘরগুলোতেও নিবাস্ত দেখব কিছু কংকাল শুয়ে আছে।’— একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করল শ্রীপতি।

আমার আর ইচ্ছেই করছিল না এগোতে। মনে হচ্ছিল যেন ভুলেই গেছি কোথায়

যাব। সন্দেহ হাঁছিল এইভাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি হেঁটে গেলেও আর কোন জীবন্ত মানুষের সংগে আমাদের দেখা হবে কি না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশে দেখা যাচ্ছিল একটি-দুটি তারা। সন্ধ্যাকাশের আলোর শেষ রেশটুকুও ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল হেমন্তের কুয়াশায়। শ্মশানঘাটের ওদিকের কুঁড়েঘরগুলিতে কোন আলো জ্বলছে না। সাধারণত বছরের এই সময়ে গ্রামের ধর্ম-পরায়ণা গৃহবধূরা মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণে বাঁশের আগায় জ্বালিয়ে রাখেন আকাশ-প্রদীপ। আর শাঁখ ও ঘণ্টার আওয়াজ সান্ধ্য পরিবেশে এনে দেয় আশ্চর্য এক ইন্দ্রজালের ছোঁয়া। প্রতিটি মসজিদ থেকে ভেসে আসে আজানের প্রলম্বিত সুর। আর খেজুর-রস পাড়ানিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে খেজুর গাছগুলো থেকে রস যোগাড় করতে। কিন্তু এখানে সবই নিশ্চূপ! একটিও জীবন্ত ব্যক্তি চোখে পড়ে না! গ্রামের পথের ধুলো এতটুকুও আন্দোলিত করে না কারো পায়ের ছাপ!

যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও জনবসতির চিহ্নমাত্র খুঁজে পেলাম না। চারদিকে শুধু আদিগন্ত ধূ-ধূ মাঠ। হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা ব্যথা অনুভব করাছিলাম আমি। কীভাবে কাদতে হয় আমি জানি না। তবু চারদিকের এই গভীর সন্তাপ দেখে বিচলিত হবার প্রকৃতদত্ত ক্ষমতাটুকু আমি হারিয়ে ফেলে নি। চারদিকে অমূল্য মানবজীবনের এই অবাধ বিনাশের চিহ্নগুলি ফুটে উঠতে দেখে, এক মূহুর্তের জন্য মনে হল খোদ জীবনের প্রতিই সব বিশ্বাসটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি।

মৌদীনীপুরের জনগণ তাঁদের জীবন-রক্ত দিয়ে লিখে গিয়েছেন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি গৌরবময় পৃষ্ঠা। এই গতকালই যাকে তাঁরা 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে মনে করেছেন তার জন্য নিজেদের শেষ করে ফেলতেও পেছপা হননি। শৌর্য ও চরম ত্যাগের এই কাহিনী আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মহত্তম ষ্ট্রাজেডিক্যালির অন্যতম।

আর আজ সেই তাঁরা এবং তাঁদের সন্ততিরাই তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছেন একেবারে আমাদের চোখের সামনে। এই অজ্ঞাত যোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের সামান্য দেশপ্রেমিকসুলভ কতব্যটুকুও কি আমাদের জাতি আজ হারিয়ে ফেলেছে? মৌদীনীপুরের গেরিমাটির এই সন্তানেরা আজ হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছেন। তাঁদের শবদেহ সংকারের জন্যও পাশে কেউ নেই। গতকাল আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন এই এঁরাই, আর তাঁদেরই দেহ আজ কুকুর আর শকুনের খাদ্যে পর্যবসিত হয়েছে। একটা গোটা জাতি তার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কি এভাবেই সম্মান জানায়?

আমরা সবাই একজোট হয়ে যদি এঁদের সামনে দন্মুঠো অস্ত্রও তুলে ধরতে না পারি মৃতেরাই শুধু উঠে আসবেন আমাদের ধিক্কার দিতে।

হোষ্ট্র কালো পনতুল

আমরা এগোতে থাকলাম। হঠাৎ ছোট একফালি জমিতে সোনালি ধান দেখতে

পেয়ে কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, মৃত্যু আর ধ্বংসের মাঝে জীবনের এই ছোট মরুদ্যানটিকে কারা এভাবে ফেলে রেখে চলে গেছে! মনে পড়ে গেল শহরে দেখা সেই ভাগ্যহীনদের কথা যারা খুব স্নেহভরে বলছিলেন ফসলের কথা। নিজেরাই ভাগচাষে ফলিয়েছিল যে ফসল। ফসল কাটার সময় অবাধ গ্রামে থাকতে পারেনি তারা। কে জানে কোন শহরে একমুঠো খাবারের জন্য নিজেদের দেহ পৰ্বশ্ত বিকিয়ে দিচ্ছে ওই হতভাগ্যরা? এই সোনালি ফসল তো তারাই ফলিয়েছিল মেহনত করে।

নির্জন গ্রামটির অপরদিকে লোকজনের থাকার সম্ভাবনা নিয়ে কিছুর একটা বলতে যাচ্ছিল শ্রীপতি, কিন্তু তারাপদ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল— ‘আরে দ্যাখো দ্যাখো, ধানখেতে কী একটা নড়াচড়া করছে?’ একটি বাচ্চা ছেলে, বছর ছয়েকের হবে, বসেছিল ওই পাকা ফসলের মাঝখানে। বেলাশেষের নেমে আসা অন্ধকার প্রায় পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছিল তাকে। শূন্য তার ছোট ভীতু-ভীতু চোখ দুটো জেগে আছে, জ্বলজ্বল করছে। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না সেই দৃশ্য! আমাদের ডাকে এগিয়ে এল ছেলটি—হাড়ের তৈরি একটি ছোট কালো পুতুল।

তার কাহিনী জানা গেল ক্রমে, ধীরেসুস্থে একের পর এক প্রশ্ন করে। বাবা মারা গেছে জ্বরে, মা কলেরায়। বড় ভাই কোন হাদিশ না রেখে বেপাভা। দশ বছর বয়সের আরেক ভাই দক্ষিণে আরেকটা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চাকরের কাজ নিয়েছে। অ্যান্ধন ওই ভাই যা পেত, তা থেকেই ভাগ করে খেত দুই ভাই। কিন্তু গত দুদিন তাকে কিছুর খেতে দেওয়া হয়নি। সে খিদেয় কাঁদছিল বলে তাকে মারা হয়েছে। এখনও তার বাঁ-হাতে ব্যথা। শেষকালে সবাই মিলে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। তার কেউ নেই। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সে যেতে পারে। দুপুর রোদের গরমে ক্লান্ত হয়ে সে বসেছিল ওই ধানখেতে—যেখানে তাকে খুঁজে পেলাম আমরা।

‘হারে, খোকা, তোর দাদার কাছে ফিরে যাবি?’ তারাপদ প্রশ্ন করে।

‘যাবনি।’ সজোর আপত্তিতে মাথা নাড়িয়ে বাচ্চাটি জবাব দেয়।

‘ওকে আর ওখানে ফেরত পাঠিয়ে কী লাভ?’ বলে ওঠে শ্রীপতি, ‘ওরা ফের তাড়িয়ে দেবে ওকে।’

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ল আমরা যে কংগ্রেসী নেতার সংগে দেখা করতে যাচ্ছি তিনি তাঁর গ্রামে একটা অনাথ আশ্রম খুলেছেন। বাচ্চাটিকে আমরা অনাথ আশ্রমের কথা বোঝালাম ‘খিচুড়ি’, কাপড় আর থাকার জায়গার কথা বললাম। সে সংগে সংগেই রাজি হয়ে গেল যেতে।

বাচ্চাটির নাম অনন্ত। ওর বাবার নাম ভরত।

কবরখানার মতো অন্ধকার ও বিষম এক পরিত্যক্ত মাঠে এই একরঙা জীবন্ত মানুষ আবিষ্কার করে আমি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম আমি। ব্যাজারভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছিল ছেলটি। কিছুর পরে বুঝলাম এইসব ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আমরা বহুবাবর ওকে আমাদের কোলে উঠতে বললাম, কিন্তু একগরমি করে কিছুতেই রাজি হল না।

তারাপদ বলল, ‘যা হয় হোক, এবার প্রথম যে ঘরটা চোখে পড়বে সেখানেই রাত কাটাও।’

আশ্রয়ের সন্ধান

এতক্ষণ আমাদের ধারণা ছিল পশ্চিমমুখো থেকে রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে বেরবে। কিন্তু ওটা বাঁক নিল উত্তর দিকে। একটা পুকুরকে পাশ কাটিয়ে রাস্তাটা সোজা প্রায় মাইল দেড়েক চলে গেছে দেখলাম। প্রথম যে কুঁড়েঘরটি আমাদের পথে পড়ল তার সামনে কাঠাচারেক জমিতে ধান ফলে ছিল।

‘কে ওখানে? কী চাই?’ আমাদের সাড়া পেয়ে গম্ভীর গলায় কে একজন বললেন।

‘একটু খাবার জল...’ বলল শ্রীপতি।

‘জল নাই।’ কিছুক্ষণ পরে জবাব এল।

গোপালপুরের কোনদিকে যদি একটু বলে দেন!’ চেঁচিয়ে জানতে চাইল তারাপদ।

‘প্রথমে পশ্চিমে যান, তারপর দক্ষিণে।’

‘আমাদের অল্প একটু খাবার জল দিতে পারবেন না?’

শ্রীপতি আবার অনুনয়ের সুরে বলল।

কোন উত্তর নেই; শুধু খুব নিচু গলায় কে যেন দু-একবার কাশলেন।

আরো মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর ভাঙাচোরা বাড়ি ও উপড়ে পড়া গাছপালার স্তূপে ঘেরা এক চিলতে ভাঁচু জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ছোট একটা কুঁড়েঘরের সামনে এলাম। ভেতরে আগুন জ্বলছিল। ডাকামাত্র সাড়া পেলাম। বেরিয়ে এলেন দুজন মাঝবয়সী মহিলা। তাঁরা শ্রীপতিকে জল দিলেন। জল থেয়ে শ্রীপতি মন্তব্য করল—‘কী দুর্গন্ধ জলে! আর তেমনি বিচ্ছিরি খেতে!’

কুঁড়েঘরটিতে পুরুষ বলতে একজন, জ্বরে ভুগছেন তিনি। মহিলাদুটি আপাতত মাছ বেচে চালাচ্ছিলেন—যদিও তাঁরা কৃষক। তাঁদের নিজেদের প্রায় বিশ বিঘে জমি রয়েছে—কিন্তু বর্তমানে সে সবই পড়ে আছে অনাবাদী। প্রায় তিনমাস পরে মাত্র হুস্তা-খানেক আগে তাঁরা মৌদীনীপুর শহর থেকে ফিরেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এখন কিছু সাহায্য পাচ্ছেন।

ওই ঘরটিতে রাত কাটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। কুঁড়েঘর না বলে ওটিকে হোগলার ছাউনি বলাটাই ঠিক হবে।

আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। আরো কিছুটা যাওয়ার পর দেখলাম অন্য একটা রাস্তা দিয়ে কাঁথর হাট থেকে ঘরে ফিরছেন দুজন গ্রামবাসী। একজনের কাঁধে বাঁক, বাঁকের

একদিকে আর্থাটন কেরোসিন ও আরেকদিকে আর্থাটন গুড়। আরেকজন মাথায় করে বইছে একগোছা কাপড়। আমাদের রাতের আশ্রয়ের সমস্যাটার কোন সুরাহার আগেই অবশ্য আবার তাদের আর আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল। তবে আমাদের ছেড়ে যাবার আগে তারা একটা উপায় বাতলে দিয়ে গেল : কাছেই নাকি প্রধানদের বাড়ি যারা স্থানীয় জমিদার এবং আত্মথেষতার জন্য নাকি এ-অঞ্চলে অনেককাল যাবত তাদের সন্ধান আছে। আগেকার দিনের লোক যদিও প্রায় কেউই আর বেঁচে নেই, তবু তাঁদের অল্পবয়সী নাতরা নাকি এখনও পরিবারের সন্ধান অক্ষুণ্ণ রাখতে সদাই প্রস্তুত। এই সন্ধানেরে তারা পদ আর শ্রীপতি দুজনেই শিশুর মতো খুঁশি হয়ে উঠল। অনন্ত নামে যে শিশুটি আমাদের সংগে ছিল তার মধ্যে কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

কেরোসিনের আলোয় একটি একতলা বাড়ির বারান্দায় মাদুরের ওপর বসেছিলেন কয়েকজন। থামের গায়ে হেলানো তিনটি কালো থেলো হুকোও চোখে পড়ল। তারা পদ আর শ্রীপতি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল; কিন্তু অনন্ত চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। বড়ো বড়ো বাড়ি থেকে তাড়া খাওয়াটা হয়তো এরমধ্যেই বেচারির ছোট জীবনে নবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতাগুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছে।

তারা পদ এবং গৃহস্থামীদের মধ্যে কি কথা হল আমি জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই আমাদের বারান্দায় ডাকল। বলল মাদুরের ওপর গিয়ে বসতে। অল্প বয়সেই বড়োটে হয়ে যাওয়া এক যুবক (—যিনি, পরে শুনলাম, ওখানকার স্থানীয় ডাক্তার এবং প্রধানদের এক বন্ধু) বাচ্চাটার কাহিনী শুনে মন্তব্য করলেন, ‘এরকম কতোই না হচ্ছে—কেউ আর গা-ই করে না!’

আমরা তাঁদের জানালাম যে আমাদের গন্তব্য গোপালপুর তাঁরা জানালেন—‘সে তো এখান থেকে অন্তত চার মাইল দূরে!’—তারপর বললেন, ‘যদি চান তো এখানে না হয় কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে যান! তারপর হেঁটে চলে যেতে পারবেন—খুব একটা বেশিক্ষণ লাগবে না...আর এই বাচ্চাটা? এর জন্য কিছু করার ক্ষমতা সত্যিই নেই!’

এ তো নয় কংগ্রেসের পথ

এদিকে, জনাকয়েক যুবক, এর মধ্যেই কাছে এসে বসেছে (প্রধান পরিবারের লোকজনও ছিল) এবং কথার ফাঁকে-ফাঁকে তাঁরা আমাদের কাগজপত্র, স্কেচ-এইসব দেখতে লাগল। দেশের হাল এই কঠিন সময় প্রভৃতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। ডাক্তারটি থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলাছিলেন। যেন আলোচনার বিষয়টা নয় অন্য কিছু ব্যাপারেও তিনি খুব উদ্বিগ্ন। প্রায়ই থেকে-থেকেই আনমনা হয়ে পড়ছিলেন তিনি।

আধঘণ্টার ভেতরেই তাঁরা আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেলেন। হঠাৎ টের পেলাম একটা জানলার ওপাশ থেকে এক বৃদ্ধা আমাদের দিকে

ঠায় তাকিয়ে আছেন। প্রধানদের ভেতর যে যুবকটি বয়সে সবচেয়ে বড়ো বৃন্দার ডাকে সাড়া দিয়ে একবার উঠে গেল সে। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে চুপ করে বসে রইল।

এদিকে বাচ্চাটির জন্য আমি খুব উদ্বেগ হয়ে পড়ছিলাম। কিছু না খেয়ে কী করে রাত কাটাতে ও? স্ন্যেচট বিনয়ের সংগে আমি আবেদন করলাম ‘বাচ্চাটাকে দয়া করে কিছু খেতে দিন!’

ডাক্তার খুব শান্তভাবে জবাব দিলেন, ‘দেবার মতো কিছুই তো নেই আমাদের। সন্দের আগেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যায়। তাছাড়া আপনাদের ভাগ্য ভালো যে আজ এ সময়ে আমাদের পেয়েছেন। আজকাল সাধারণত আমরা গ্রামে রাত কাটাই না।’ প্রধান-ভায়েদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়ো তিনি অবশ্য বললেন: ‘যাইহোক, অন্যেরে ওরা দেখছে আপনাদের সবার জন্যে কিছু রান্না-টাঁধা যায় কিনা।’ ডাক্তার কিন্তু বলেই চললেন তাঁর কথা, যেন কিছুই তিনি শোনেননি।

‘আসলে ফসল কাটার সময় কাছে বলেই আমাকে মাঝেমাঝে এক-আধবার আসতে হয়; তা নইলে আজকাল কেউ গ্রামে থাকতে চায় না—চারদিকে এইসব ডাকাতদের মাঝখানে।’ একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, ‘যত নগের গোড়া মশাই ওই কংগ্রেস। কংগ্রেসই পথ দেখিয়েছে চোর-ডাকাতদের। আর কংগ্রেসের জন্যেই আমাদের আত্মরক্ষার শেষ সম্ভব যে বন্দুক সেটাও হাতছাড়া হয়েছে। আর, এ বছর তো মনে হচ্ছে ফসলটাও ঘরে তুলতে পারব না।...’

তারাপদ আর আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অন্যান্য গুলিগালাজে যথেষ্ট বিরক্তিতে শিহরিত হতে লাগলাম। আর বেচারী শ্রীপাতি অসহায়ভাবে সকলের দিকে তাকাত্তে লাগল। না, না, কংগ্রেস কখনোই চোর ডাকাতকে রাস্তা দেখাচ্ছে না! আপনারা কি খবরের কাগজ পড়েন না? আপনারা কি গান্ধীজীর প্রত্নবাদ, সরোজিনী নাইডুর বক্তব্য এসব পড়েননি?’

আমাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ডাক্তারকে ধাক্কা দিতে পারল মনে হল। প্রায় ঘণ্টা দুই লেগে গেল ডাক্তারসম্মত সবাইকে একথাটা বোঝাতে: কিছুদিন আগে যে ‘স্যাবোটেজ’ দেশটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল সেটার সংগঠক গান্ধীজী নন, কংগ্রেস নয়, বরং কংগ্রেস নামধারী কিছু অসাধু লোক, সি. এস. পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক। আমরা তাঁদের একথাও বোঝাতে সক্ষম হলাম আজ যারা ভিখিরর হাত থেকে তার শেষ একমুঠো খাবার ছিনিয়ে নিচ্ছে, সব্বহারী স্ত্রীলোকের অংগের শেষতম চট্টকুণ্ড ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারা ডাকাত নয়, নিছকই সাধারণ চাষী-টারি। প্রেফ খিদের তাড়নায় এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বন্দুক দিয়ে এদের থামিয়ে রাখা যাবে না; এদের ক্ষুধার্ত হাতের মুঠো থেকে ভাতের থালা বাঁচানো বন্দুকের কন্মো নয়। শুধু এক মুঠো খাবারই তাদের শান্ত করতে পারে। খিদের তাড়নায় মরিয়া হয়ে উঠে, এরা যাদের খপ্পরে পড়েছে তারা দেখতে চায় দেশটা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাক। আমাদের কতর্বা হল সত্যিকারের সং এই দেশসেবকদের ওই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে উদ্ধার করা। এদের জন্য দুঃখমুঠো

অন্নের ব্যবস্থা করে। সামনের আমন-ফলনের সময়ই তা না করতে পারলে আপনাদের মতো লোকদেরও আত্মরক্ষার উপায় থাকবে না। শূদ্ধ তাই নয়— রক্তগঙ্গা বইবে সারা দেশে। সঙ্গে থাকবে আমাদের প্রভুর গুলি, জাপ-আগ্রাসন আর বোমা।

প্রত্যেকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং উৎসাহের সংগে প্রশ্ন করে করে পরিস্কার করে বদুবে নিচ্ছিলেন নানান প্রশ্ন ও খটকা। জীবনের সমস্যা তাঁদের কাছে এতটাই বাস্তব হয়ে উঠেছিল যে সমস্ত একাগ্রতা নিবন্ধ হয়েছিল কোন-না-কোন সমাধানের ওপর, নিছক দলাদলির ওপর নয়।

‘আজ অনেক কিছুই একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখলাম।’ বললেন ডাক্তারটি। ভদ্রলোক আমাদের কাগজগুলো উৎসাহ নিয়ে পড়া শুরুর করলেন। কিন্তু আলোচনা শেষ হবার কিছু পরেই তাঁর মুখে আবার নেমে এল সেই অসহায়তার ছাপ। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝিমিয়ে পড়লেন। প্রধানদের বড়ো ভাইয়ের চোখে অবশ্য একটা নতুন আভা দেখা যাচ্ছিল। শ্রীপতি তাঁকেও এই জমাটি আলোচনাটার মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিল। শূদ্ধ ডাক্তারটিই সমস্ত আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলার সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছিল। হাঁটু মূড়ে, দু-হাতে হাঁটু-দুটি জড়িয়ে ধরে বসে বসে তিনি বাইরের অন্ধকারের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। দেশপ্রেম যে শক্তির সঞ্চার করে সেই শক্তি কখন যে তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন তা জানি না। কিন্তু আজ তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল পরাজয়বাদ ও আদর্শচ্যুতির এক প্রতিমূর্তি বিশেষ। মানুষকে এই অবস্থায় দেখলে করুণার চেয়ে বড় বেশি লজ্জা হয় আমার। কিন্তু একথা স্বীকার না করেও উপায় নেই, ওই ডাক্তারটি ছিলেন মেদিনীপুরের মধ্যবিস্তৃষ্টশ্রেণীর প্রতীক-স্বরূপ—অন্তত ওই নভেম্বরে আমি তাঁদের যেমন দেখেছি। ভবিষ্যতের কথা আলাদা।

রিলিফের একটি দানাও ওরা নষ্ট করে না !

পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের আগেই আবার পথে নামলাম আমরা। আরো চার মাইল যেতে হবে। ভেবেছিলাম বাচ্চাটাকে সকলেই কোলে করে-করে নিয়ে যাব। কিন্তু একগুঁয়েভাবে ও নিজেই রাজি হল না কোলে চড়তে।

প্রথম যে লোকটিকে আমরা রাস্তায় দেখি সেই মাঝবয়সী মানুষটি ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। জাল দিয়ে খাল থেকে মাছ ধরছিল সে। হয়তো কাছোঁপঠে কোথাও গামছাখানা খুলে রেখেছে। কাজ সেরে গা শুকিয়ে পরবে বলে। যদিও সেই মহুদুর্ভে, খালের ধারে, ঝোপঝাড়ের মাঝখানে, উলঙ্গ মানুষটিকে দেখে অতি প্রাচীন যুগের কথা মনে পড়ে গেল। আর মনে হল এ-যেন যা-কিছু এখনো আগামী এ কেবল তারই এক পূর্বাভাস। যেন সমাজের হ্রিত ভাঙনের একটি দৃষ্টিকোণ মাত্র।

মাছ ধরায় ব্যস্ত এমন আরো কিছু পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দেখা পেলাম রাস্তায়।

প্রায় সকলেই উলঙ্গ, কালো চামড়া ঠেলে ফুটে ওঠা কয়েকটি হাড়ের শরীর। তাদের কোটরগত চক্ষু নিবন্ধ কর্দমাক্ত জলের ওপর— আর শিশুদের লোভাতুর দৃষ্টি নিবন্ধ তাদের মায়েদের ব্যস্ত হাতগুলির দিকে। অবশ্য এরকম লোকজনও খুব বেশি দেখতে পেলাম না। চার মাইলের ভেতর বড়জোর দশ কি বারোজন।

নতুন ফসল, যার প্রতিটি শিশু প্রায় কলার কাঁদির মতো লম্বা, সেই নতুন ফসল— ফলে আছে— তবে এখানে-ওখানে ছড়ানো সামান্য কয়েক কাঠা জমিতেই। আর বিঘের পর বিঘে পড়েছিল অনাবাদী।

অতি-লাজুক তিনজন চাষী-বৌ কলসী করে জল বয়ে আনিছিল। কোথা থেকে? মাইল দেড়েক দূরের গোপালপুর থেকে। আরো মাইল খানেক গেলে তবে তাদের ঘর।

পরে আমরা জেনেছিলাম যে গোটা কাঁথি মহকুমার নাকি পানীর জলের ভীষণ অভাব— বিশেষ করে ভেতরের গ্রামাঞ্চলগুলিতে। বন্যার পর পুকুরগুলোর জল হয়ে গিয়েছিল নোংরা ও তেতো। অনেকগুলো পুকুরে বড় বড় গাছ পড়ে পচছে দেখেছিলাম। আর ত্রিশ-চল্লিশটা করে গ্রাম নিয়ে গড়া একেকটা ইউনিয়নে ছিল মাত্র তিনটি, চারটি কি বড়জোর ছ-টি টিউবওয়েল। ফেব্রার পথে আমরা একটা ভাঙা টিউবওয়েল দেখতে পাই। আরো কতো টিউবওয়েল ওইরকম ভেঙে গেছে তা কেই বা জানে!

অনাহার আর ম্যালেরিয়ার ওপর জলাভাব! দুর্বল ও ক্ষীণ শরীরে ক-জন পারে মাইলের পর মাইল জলভরা কলসী বইতে? একটা দেশলাই-এর দাম যখন ছ-পয়সা, ক-জন পারে তখন খাবার জল ফুটিয়ে নিতে?

শুনিয়েছিলাম কলকাতার মেয়রের তহবিল থেকে নাকি এক লক্ষ টাকা নলকুপ-খননের জন্য ধার্য হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। কয়েক জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে গ্রাণকার্যের জন্য পুকুর খোঁড়া হয়েছিল ঠিকই তবে তা নামকাওয়াস্তে, অথচ কাটা সেইসব পুকুরের পাড় বারকয়েক বৃষ্টির পরেই ধ্বংস গিয়েছিল— আর বাইরের জমা বৃষ্টির জল ঢুকে সেই পুকুরগুলোকে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলে শুধু। এছাড়া আর কোন কাজই হয়নি।

আমি কখনও ভুলব না পথে দেখা ভূষার ছোট অথচ মর্মস্পর্শী সেই ছবিটি। মরা একটা বটগাছের তলায় বসে আছে অবিদ্যাক্ত এক বৃদ্ধা— তাঁর হাড় বের-করা হাতদুটি একাঁট কলসীর ওপর রাখা— মাথার ওপর জ্বলছে মধ্যাহ্নগণের খর সূর্য— আর একফোঁটা জলের চিহ্ন নেই কোথাও...

অসাধারণ কিছুই নয়! হয়ত বৃদ্ধার শূন্যকিয়ে যাওয়া ও কোঁচকানো চামড়া, ফুলে-ওঠা শিরা-ধমনী আর জ্বলন্ত, টকটকে লাল চোখ আমার পক্ষে একটু বেশিই মর্মস্পর্শী হয়ে থাকবে! কিন্তু একথা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই যে বৃদ্ধাটিকে দেখে আমি স্বর্ণপিণ্ডের কাছে শূন্য একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম।

একফোঁটা খাবার জলও যেখানে নেই—সেখানে যে ভিখিরির শেষ অন্ন, স্ত্রীলোকের

লজ্জা-ঢাকার শেষ বস্ত্রখণ্ডটাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এতে অবাক হবার কী আছে !

হায়, মেয়ের সাহেবের গ্রাণ তহবিলের লক্ষ টাকা !...

সকাল আটটা নাগাদ আমরা গোপালপুর পৌঁছলাম। গাছপালার আড়ালে ঢাকা একটি গ্রাম যার চারপাশ দিয়ে সাত-আট কিউবিকফুট গভীর ও দশ-পনেরো কিউবিকফুট চওড়া একটি খাল বয়ে গেছে। দক্ষিণে, দূর দিগন্তের কাছে সমুদ্রকে সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে দেখা যাচ্ছে যেন রূপোর তৈরি একটি সরু তার। ডানদিকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে দেখা গেল ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত একটি গ্রাম আর, ধ্বংসস্তূপের মাঝে ইতস্তত উপড়ে-পড়া গাছের নিম্পন্দ শাখা-প্রশাখা। একদিকে বেশ অনেকটা জায়গা জোড়া বালি-জমি চোখে পড়ল। আমাদের বলা হল, একসময় ওখানে নাকি বড়ো একটা গ্রাম ছিল—ঘূর্ণিঝড়ের পর শূন্য ওই বালিই রয়ে গেছে চিহ্ন হিসাবে।

এখানে-ওখানে ছোট ছোট দু-এক টুকরো জমি ভরে আছে ধানে। সেপ্টেম্বরে বোনা বীজ নভেম্বরের গোড়াতেই পাকা ফসল ফলেছে।

আর রাস্তার ধারে বসে এক বৃদ্ধি বিধবা তাঁর শীর্ণ আঙুলে করে শ্যামাঘাসের বীজ তুলছিলেন। তিনঘণ্টা চেষ্টা করেও তিনি একমুঠোও জড়ো করতে পারেননি। খাবার বলতে ওইটুকুই এখন বৃদ্ধার সম্বল। মাঠের মাঝখান দিয়ে এক পুরুষ ও নারী মাথার করে শাপুলার ফুল আর লতা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এদেরও খাবার বলতে এখন আর কিছই নেই নেই।

আর আশ্চর্যের কথা হল, সরকার এই সব জায়গার জন্য গ্রানের কোন বন্দোবস্তই করেননি ! কারণ রিলিফের চাল আটা তাঁরা একফোঁটাও নষ্ট করতে রাজি নয় !

ছিনিয়ে নিয়েছে পতাকাটা

এমন কিছ্ মানুষ আছে কোন কিছ্তেই তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায় না। এমনকি ঘোরতর নৈরাস্যের চাপের মধ্যেও তাদের দীর্ঘস্বাস ফেলতে দেখা যায় না।

গোপালপুরের কংগ্রেসী নেতাটি ঠিক এই ধরনের মানুষ। এখানে আমরা তাঁকে যতীন্দ্র দাস বলেই উল্লেখ করব। প্রায় বছর চল্লিশ বয়স ভদ্রলোকের। দোহারা চেহারা, গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল। ছোটভাই এবং মাঝবয়সী দুজন প্রতিবেশীর সংগে ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁর নতুন তৈরি কুঁড়েঘরের বারান্দায়। আমাদের দেখামাত্রই তিনি দূরহাত বাড়িয়ে তারাপদকে অভ্যর্থনা জানালেন।

আসতে-আসতে ভদ্রলোক সম্পর্কে অনেক কথাই তারাপদ বলেছিল রাস্তায়। ঘূর্ণিঝড় এবং তারপরেই বন্যার সবকিছ্, এমন কি একমাত্র শিশুটিকেও, হারানোর পর তিনি ও তাঁর স্ত্রী কোনক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। কাঁথিতে পদার্পণ করা মাত্র তাঁকে বন্দী করা হয়। ভিজে কাপড়গুলো বদলাবার সময়টুকুও দেওয়া হয়নি তাঁকে। নিজেই

পরে আমাদের শোনালেন এসব, এবং সেই একইরকম হাসি মুখে, যেন সমস্ত ব্যাপারটা ছিল একটা নিছক ভাষাশা। মাত্র কয়েকদিন আগে ছাড়া পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের গ্রামে ফিরে আসেন এবং ফিরেই দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই অনাথ আশ্রমটি তাঁর সেই কঠিন সংগ্রামের ধরাছোঁয়ার মতো প্রথম ফল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক। মনে হল কতকালের চেনা যেন।

গোড়া থেকেই ভদ্রলোক চেষ্টা করছিলেন সমস্ত রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে যেতে। যে-মুহূর্তে আমরা রাজনীতি সংক্রান্ত কোন কথা বলতে যাচ্ছিলাম— তৎক্ষণাৎ উনি হেসে কোন বুদ্ধিদীপ্ত বক্তোক্তি বরে ভেঙে দিচ্ছিলেন আলোচনার বিষয়টাকে।

আমরা প্রথমটার বদ্ব্যবহারেই পারিনি ভদ্রলোক কংগ্রেসী নেতা, তদুপরি খুবই জনপ্রিয় এবং নিজের অঞ্চলে বিশেষ গণ্যমান্য হলেও হাজারো লড়াই আর টানাপোড়েনের ফলে রাজনীতি তাঁর কাছে এখন একটা ব্যাধির মতো হয়ে উঠেছে। ‘কোন রাজনীতি নয়, দোহাই আপনাদের। বরং যদি পারেন তো বলুন কী করে আরো আরো বেশি সাহায্য যোগাড় করা যায়।’ বলছিলেন তিনি। আর, কথাগুলো উচ্চারণ করার সময়ে তাঁর মুখের হাসি দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে গ্রাণের নামে বাংলায় যে অনন্য প্রহসন অভিনীত হয়ে চলেছে তারই উল্লেখ করছিলেন তিনি। নিজের ভুলটা আমি বদ্ব্যবহারে পারলাম যখন আমাদের আলোচনাটা ঘুরে গেল ‘সংগ্রাম’-সংক্রান্ত প্রশ্নের দিকে। তিনি বললেন, ‘সত্যিকারের সংগ্রাম আদৌ শূন্যই হয়নি। সংগ্রামের নামে যা সব ঘটছে তার সংগে কংগ্রেসের সম্পর্ক ততটাই যতটা থাকে একজন শ্রমী আর তার দেওরের মধ্যে। জওহরলাল আর সুভাষবাবুর সম্পর্কটা কেমন সেকথা তো আপনাদের জানাই। চোখের পলক পড়তে না পড়তে যাদের আমরা দেশের শত্রু বলে মনে করি তারাই আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেসের পতাকাটা। তার পরে কি সমস্ত অবমাননাকর ঘটনা ঘটেছে তাও জানেন আপনারা। কংগ্রেসের নাম নিয়ে ওরা যথার্থ ও সং কংগ্রেসীদের ঠেলে দিয়েছে আত্মহননের পথে। আমিও ওদের ফাঁদে পড়েছিলাম। ...তো যাইহোক, এ-সব নিয়ে কথা বলে কোন লাভ নেই। আশার আর কোন জায়গাই নেই। যা সারাবার নামে পা-টাঁই যে কেটে বাদ দিয়েছি।’

ভদ্রলোকের মুখমণ্ডলে তখনো ছাড়িয়ে ছিল সেই উজ্জ্বল হাসির আলো কিন্তু তাতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নৈরাশ্য আর ঢাকা পড়ছিল না।

“আপনি যাকে ‘সংগ্রাম’ বলে দেখতে চাইছেন সেটাই কি আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির একমাত্র পথ?” শাস্তভাবে জানতে চাইলাম।

‘তা জেনে আপনার কাজ কী?’—তিনি পাগটা প্রশ্ন করলেন হাসতে হাসতে।

কাজ আপনাকে জানাতে পারা যে আরো একটা পথ রয়েছে, যে পথে গোটা পৃথিবীকে আমরা পাশে পাব যে পথে কোন শত্রুই, যতো শক্তিশালীই হোক না সে আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।’

“...‘পথ’?? আবার! ? ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন আরো আরো সব ‘পথ’ থেকে! জানেন মশাই, ‘পথ’ আর ‘ফাঁদ’ আলাদা করার সমস্ত ক্ষমতাটাই ইদানিং আমি হারিয়ে ফেলেছি!” হাসতে হাসতে মস্তব্য করলেন তিনি। আরো বললেন, “ওই বৃদ্ধটি— ওই গান্ধীজী যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আমার আর কোন ‘পথ’ নেই। উনিই আমার ‘পথ’— আর কেউ না।”

আমি নিজের অজান্তেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। বললাম, ‘মহাত্মাজীই আমার পথ’ এই বলে ছুপটি করে বসে থাকা, কংগ্রেসের পতাকা শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়েছে এই অজুহাতে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া এই-ই কি আজকের একমাত্র পথ? এই-ই কি মহাত্মাজীর প্রতি আপনার শ্রদ্ধার বাস্তব অভিব্যক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করেন? তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কারাবরণ করেছেন, যাতে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার জনগণের সেবার লাগতে পারেন। আপনি কি মনে করেন যে আপনি তাঁর মৃত্তির জন্য যথাসাধ্য করেছেন; অথবা, আমাদের দেশের বর্তমান সময় বা পরিস্থিতি কি আপনাকে রাজনীতি ত্যাগ করার অনুমতি দিচ্ছে?”

জয়ের পথে না রয় সংশয় !

এর পরে, আলোচনার শেষ অবধি ভদ্রলোককে আর তাঁর সেই স্বভাবগত হালকা মেজাজে দেখা গেল না। তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে আর কোন সন্দেহই রইল না— আমার কথাগুলো তাঁকে ভাবিয়েছে। আমাদের বই ও কাগজপত্র থেকে প্রাসংগিক কিছু অংশ তুলে ধরলাম, তিনিও খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পড়লেন, এবং বেশ জোর গলায়, যাতে সকলেই শুনতে পায়। তাঁর ছোটভাই একবার আমাদের সংগে ঠাট্টা করতে শত্রু করলেন আমাদের স্লোগান ‘করেংগে ইয়ে জিতেংগে’-র বাঁকা মানে করে। যতীনবাবু তাঁকে থামিয়ে দিলেন, এবং বললেন— ‘আজ আমাদের সংকল্প এটাই হওয়া উচিত। —আমাদের আজ অবশ্যই চলা উচিত এমনভাবে যাতে জয়ের পথে আর কোন সংশয় না দেখা দেয়।’

ফিরে আসার সময়ে ভাবছিলাম মেদিনীপুরের এক সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের কথা, যতীনবাবুর মধ্যে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম। অদম্য শক্তি, অসীম ত্যাগ ও রাজনীতির জটিলতা থেকে ঠিক ও ভুলকে চিনে নেবার মতো ধৈর্যসম্পন্ন এক দেশসেবক। এই ধরনের দেশসেবকের কাছে অন্য সবকিছুর চাইতে বড়ো হল কাজ— জনগণের জন্য কাজ, তা সে যত কঠিন, যত বিপদসংকুলই হোক না কেন— কারণ জনস্বার্থে নিজের জীবন বিনাবাক্যে বিসর্জনে প্রস্তুত সে।...দুঃখের কথা হল এই অন্ধ দেশভক্তিই বিশ্বাস-ঘাতকদের ষড়যন্ত্রের সহজতম শিকার হয়ে ওঠে।

হাজতবাসের সময়ে যতীনবাবুর মাথার মধ্যে কেউ এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে কমিউনিস্টরা হল ব্রিটিশ সরকারের দালাল এবং ব্রিটিশ স্বার্থের মুখ চেয়েই তারা

জাপশক্তি ধ্বংস কামনা করে। দ্ব-বংটা ধরে এ-ব্যাপারে তিনি মূখ বৃজ্জিছিলেন পাছে তাঁর এই সংশয়ে আমরা ক্ষুণ্ণ হই। অবশেষে, নিজের সব সংশয়ের নিরসনের পর তিনি নিজেই কথাটা জানালেন। শেষকালে, আমাদের চলে আসার সময়ে, তিনি নিজের কাছে রেখে দিলেন লাহিড়ীবাবুর ‘৯-ই অগাস্টের এক বছর’, বিভূতি গুহর ‘পঞ্চমবাহিনী কাহারো’ এবং যোশি-র ‘দেশপ্রেমিকদের জাগাও’ এসব বইগুলি— নিজে পড়ার জন্য, এবং তাঁর অনুগামী কিছু দেশপ্রেমিক যুবককে পড়ানোর জন্য।

ম্যালেরিয়া প্রসংগেও তাঁর সংগে কথা বলেছিলাম আমরা। বারবার তাঁর আমাদের বলিছিলেন ম্যালেরিয়া নিয়ে কোন ভয়ভর তাঁর নেই। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অমন আস্থা খুবই আনন্দদায়ক, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা শেষ হবার আগেই তিনিও আক্রান্ত হলেন জ্বরে। তৎসঙ্গেও তিনি ‘জনগণের সংগ্রাম’ থেকে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন এবং প্রবল উৎসাহে আলোচনা চালিয়ে গেলেন।

উপরের অনুচ্ছেদগুলি লেখার উদ্দেশ্য একথা প্রমাণ করা নয় যে এই কংগ্রেসী নেতাকি একটা কমিউনিষ্ট পারিণত করেছিলাম। মনে পড়ছে আমি নিজেই বলিছিলাম ঠিক ‘একজন প্রকৃত কংগ্রেসী হওয়া যতটা কঠিন, আমার মনে হয় একজন প্রকৃত কমিউনিষ্ট হওয়া তার চেয়ে কিছু কম কঠিন নয়।’ না, কমিউনিষ্ট হয়ে যাননি ভদ্রলোক। আমরা শুধু পেরেছিলাম তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যেটুকু হতাশার প্রমাদ মিশে যাচ্ছিল তা থেকে মুক্ত হতে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করতে। আমরা শুধু পেরেছিলাম একজন কংগ্রেসীকে আরো সচেতন করে তুলতে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসীদের ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে। দেশের সামনে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে সেই ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করতে। এর চেয়ে বেশি গৌরবের আশ্রয় আর আমার কী-বা থাকতে পারে? •

ভিড়ে ঠাসা অনাথ আশ্রম

অনাথ আশ্রমটা দেখতে গেলাম। একেবারে কাছেই— তিনদিকে ও পেছনে খাল দিয়ে ঘেরা একটা একতলা বাড়ি। সামনে একটা টিউবওয়েল— বহুদূর থেকে গ্রামবাসীরা সেখানে এসেছেন জল নিতে।

অনাথদের সংখ্যা প্রথম দিনে ছিল পাঁচ, দ্বিতীয় দিনে পঁচিশ এবং তৃতীয় দিনের প্রথম দ্ব-বংটার মধ্যেই তিরিশ। প্রায় সকলেই এসেছিল কোন আশ্রয় ছাড়াই। বয়স্ক চাষীরা আসেছিলেন আগেভাগেই তাঁদের সন্তানদের ওখানে রেখে যেতে। তাঁদের একজন বললেন— ‘নিজে জ্বর ভুগছি। দ্ব-পা হেঁটে খাবারটাও যোগাড় করতে পারি না। এর মা এই জ্বরেই মারা গেছে। মনে হয় আমারও সেই একই দশা হবে। ছেলেকে তাই আপনাদের কাছেই রেখে যাচ্ছি। দেখবেন, যেন না খেতে পেয়ে মারা না পড়ে বেচারী।’

আরেকজন — তাঁর মুখে রা-টি নেই। দুই ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে এসে-
ছিলেন তিনি। অন্যথ আশ্রমের সামনে বাচ্চাদের দাঁড় করিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।
একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে ভেতরে নিয়ে গেল বাচ্চাদের। লোকটি কিন্তু একভাবেই
চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন— ধূতির কানায় গা ঢেকে, আশ্রমটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।
কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন তিনি। আমরা জানতেই পারিনি কখন!

দশজনেরও বেশি শিশুর বয়স ছিল তিন কি চার। প্রায় পনেরজনের বয়স ছয় কি
সাত। আর বাকি সকলেরই বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে। বেশিরভাগই চাষীদের ছেলে।
একজনের বাবার ছিল আশি বিঘে জমি— গেল বর্ষায় তিনি জ্বরে ভুগে মারা যান।
আর তারপর ওদের জমিগুলোও অনাবাদীই পড়ে থাকে। মা কোন এক পরিবারে
পরিচারিকার কাজ করছিলেন— আর ওই পরিবারটির দাম্ভিক্যের ছেলেটি বেঁচে থাকতে
পেরেছে এতদিন। ছেলেটা শেষকালে এক সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভোগার পর এই অন্যথ
আশ্রমটির কথা জানতে পেরে তারাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে।

আরেকটি ছেলে। তার বাবা নুন তৈরি করে হাটে বেচতেন, দিন পাঁচেক আগে
তিনি যথারীতি হাটে গিয়েছিলেন— কিন্তু আর ফেরেননি। ছেলেটাকে উপোস দিতে
হিচ্ছিল। অবশেষে সে নিজেই খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছে।

দুটি শিশু। ভাই আর বোন। মেয়েটার গায়ে একটা নোংরা কম্বল। রাতে শীতে
কাঁপতে কাঁপতে ছেলেটা কম্বলের একটা কানার জন্য মেয়েটার সঙ্গে নিখাত লড়াই করে
থাকবে; আর কম্বলের একটু ভাগও না পেয়ে মেয়েটার মূখে থিমাচিও কেটেছে হয়ত।
থিমাচি কাটার দাগ এখনও লেগে আছে মেয়েটার মূখে।

বিছানা বলতে ছিল একজোড়া মাদুর। আর বেশিরভাগ বাচ্চাই ছিল পদুরোপদুরি
ন্যাংটো— এই নভেম্বরে, চারদিকে বিষাক্ত মশার মধ্যে।

অন্যথ আশ্রমটির খরচ চালাচ্ছিল গুজরাট সেবা সমিতি। কিন্তু জমিনসপত্রের
জোগান ছিল খুবই কম। খুব অল্প পরিমাণ চাল আসছিল— আর তা-থেকেও আবার
চুরি হিচ্ছিল। এক স্বেচ্ছাসেবক আমাকে জানালেন যে একবার নাকি ছ-মণ চালের
জায়গায় তাঁরা প্রায় বারো সের কম পেয়েছিলেন!

ত্রাণ নয় সকলের তরে

মেদিনীপুর শহরে সমস্ত পার্টি ও গ্রাণকর্মীরা বঙ্গীয় গ্রাণ সমিতির তলায়
ঐক্যবন্ধ হলেও নভেম্বরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ যে সস্তা চাল (সাড়ে পাঁচ টাকা দরে)
পাঠিয়েছিলেন তা পাঠানো হয়েছিল গিরিশ দাস নামে জনৈক মহাসভাপন্থী ব্যবসায়ীকে,
এবং গ্রাণ সমিতিতে নয়। কাঁথিতে অবশ্য বঙ্গীয় গ্রাণ সমিতি শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে
সস্তা চাল ও অন্য কিছু সামগ্রী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। সমিতিটিতে মহাসভা-
পন্থীদের সংখ্যা ও প্রভাবের আধিক্যের জন্যই হয়তো তা সম্ভব হয়েছিল।

তমলুক সাব-ডিভিশনের গ্রাণ সমিতিটিও গড়া হয়েছিল সর্বদলীয় প্রতিনিধি নিয়ে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এখানেও কোন সাহায্যই পাঠাননি; যতকিছু পাঠিয়েছিলেন সে সবই আর্য সমাজ আর মহেন্দ্র স্মারক সংঘের কাছে। প্রথমটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক গোষ্ঠী; কিন্তু দ্বিতীয়টির ওপর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণের কথা আর অপ্রকাশিত ছিল না।

ফেরার পথে আমরা পেলাম পায়রাছালি বলে একটা গ্রাম। গ্রামবাসীদের একজন বললেন এখানে নাকি পাঁচশো লোকের বাস ছিল; আরেকজন বললেন তিনশো। তকটা অবশ্য অবাস্তব। কেননা বর্তমানে গ্রামটিতে ছিলেন মাত্র পাঁচশজন! বছরখানেক আগেও তাঁরা উৎসাহভরে ৯ অগাস্টের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং সাহসের সঙ্গে মদুখোমুখি হয়েছিলেন বেয়নেট ও মেশিনগানের। পরে, আমলাতন্ত্রকে শিক্ষা দেবার জন্য, নিজেদের সমস্ত খাদ্যসম্ভার তাঁরা সমর্পণ করেছিলেন মজদুদারদের হাতে। আর তার পরেই অনিবার্যভাবে শূন্য হয়েছিল একমুঠো ভাতের জন্য শহরাভিমুখে পদযাত্রা, উপোসের ওপর এসেছিল ম্যালেরিয়া। আর এখন মাত্র পাঁচশ জন পড়ে আছেন!

ব্যক্তিটির নাম ক্ষেত্রমোহন নায়েক। অন্যান্যদের মতোই একজন কৃষক। অনাহার আর ম্যালেরিয়া শেষ করেছে তাঁর স্ত্রী ও শিশুকে। আর মৃতের সংকার সারার আগেই তিনিও আক্রান্ত হয়েছেন ম্যালেরিয়ায়। আমরা যখন তাঁকে প্রথম দেখলাম, শুন আর কুকুরেরা তখন তাঁর আত্মীয়ের মৃতদেহের বখরা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। আগের রাতে শ্মশানঘাটে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে সেই মৃতদেহ। কিন্তু চিতা জ্বালার আগেই শবযাত্রীদের প্রত্যেকেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়েই তাঁরা তখন মৃতদেহ ফেলে রেখে নিজের-নিজের ঘরে ফিরে যান। ভাবিছিলাম তাঁদের মৃতদেহগুলি অন্তত শ্মশানঘাট অবধি নিয়ে আসার মতো লোক ও বেচারাদের কপালে জুটবে না!

ক্ষেত্রমোহনের মতো নির্যাত আজ আর বাংলার জেলাগুলিতে বিরল নয়। অথচ ধারা ক্ষেত্রমোহনদের মুখের খাবার ছিনিয়ে নিয়ে মোটা মুনোফা কামাচ্ছে তাদের আমরা শূন্য ক্ষমাই করি না— বরং উৎসাহ দিয়ে যেতে থাকি।

কিন্তু এই অবস্থা আর চলতে পারে না! এ-বছরের আমন ধান যদি মজদুদারদের থাবা থেকে বাঁচানো না হয় তাহলে সারা দেশজুড়ে জ্বলে উঠবে আগুন।

কাঁথি সাব-ডিভিশনের দক্ষিণাঞ্চলগুলি, যেখানে ধানের খেত 'যেন সোনার পরাত' সেসব জায়গার দশ শতাংশ জমিতেও চাষ হয়েছে কিনা সন্দেহ। জনৈক কৃষক আমাদের বলেছিলেন যে তাঁর পাঁচভুর বিঘে জমির মধ্যে তিনি চাষ করেছিলেন মাত্র ন-বিঘেয়। বীজ, বলদ, সার, খাদ্য ও অর্থের চূড়ান্ত অভাবের ওপরে জুড়ে বসেছিল ম্যালেরিয়া। নেই খেতমজদুর।

আর, এইসব লোকের জন্য সরকারি কোন সাহায্যই আসেনি, যেহেতু ধরেই নেওয়া হয়েছিল এরা 'সক্ষম'।

কে দেখাবে পথ ?

মৌদীনীপুত্র থেকে কলকাতা ফেরার পথে মনে পড়ছিল মৌদীনীপুত্রের রাস্তায় দেখা সেই চাষী বৌটির কথা— ‘সত্যি বলতে কি বাবু, কী-টা আশা করে আমরা গ্রামে ফিরব ? গেলবার খারাপ ফলন হয়নি, শুবু নিজেদের গ্রামেই কিছু খেতে পাইনি আমরা... ।

এছাড়াও মনে পড়ছিল শীর্ণকায় ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দুটি কৃষক তরুণের কথা । তারা কাঁথির একটি শ্মশানঘাটের অনতিদূরে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা চান্দাচুরের দোকান খুলে বসেছিল । বলল, ‘কী বলব আপনাদের বাবু ? আপনারা পরিষ্কার জামা-কাপড় পরেন, ইংরেজি জানেন— আপনারা তো আমাদের নিয়ে ভাবেনই না । আমাদের দুঃখকষ্ট দেখে আপনারা হয় দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর তারপর সব ভুলে যান, আর নয়তো বাইরে দয়ার ভান করে ভেতরে ভেতরে আমাদের সব কিছু হাতিয়ে নেবার ফন্দি আটেন...হ্যাঁ, আমরা কৃষক সমিতির কথা শুনেছি...আমরা জানি যে, এককাটা না হলে আমাদের কোন উপায় নেই, কিন্তু কে দেখিয়ে দেবে কিভাবে সেটা হবে ? আপনারা তো কখনোই আমাদের কাছে আসেন না...নইলে আমরা কী টা না করতে পারি ? এই কিছুদিন আগেই আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়ে মরতেও তৈরি ছিলাম আমরা । কিন্তু কারো সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে আমরা তো ঠিকই করতে পারি না কীভাবে এগোব । আপনারা পথ না দেখালে আমরা তো কোনভাবেই এগোতে পারি না ।’

ওদের পথ দেখাতে পারে এমন কেউ কি নেই ? □

অনুবাদ : সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

HUNGRY BENGAL





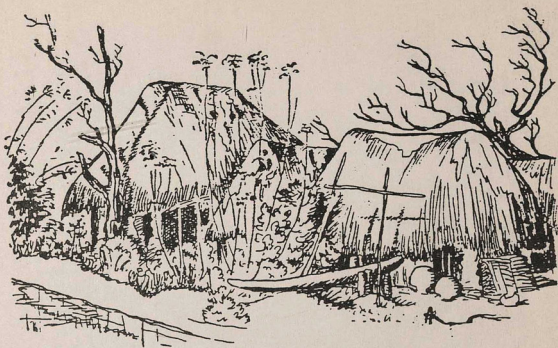
Chittaprasad
5/2/23, Contra



Bowbazar St. Calcutta

Chittambram Sept 17/73









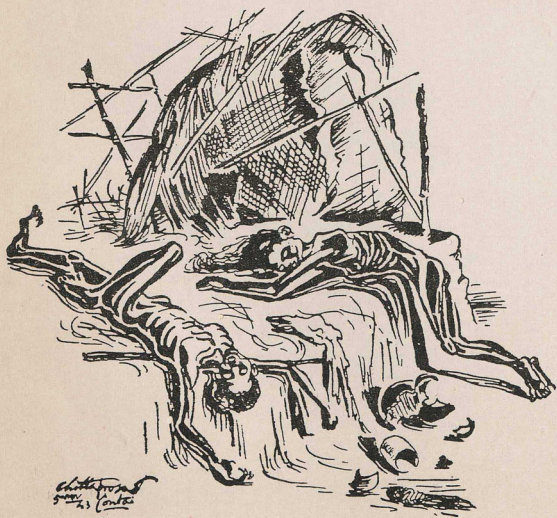




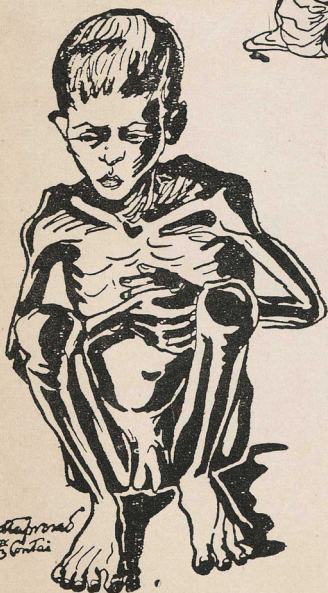


Artista: P. S. S. S.
7/05/1954













Chittaprasad
5/2/83 Conte